দস্যু বনহুর
পাতালপুরীতে দস্যু বনহুর
রোমেনা আফাজ
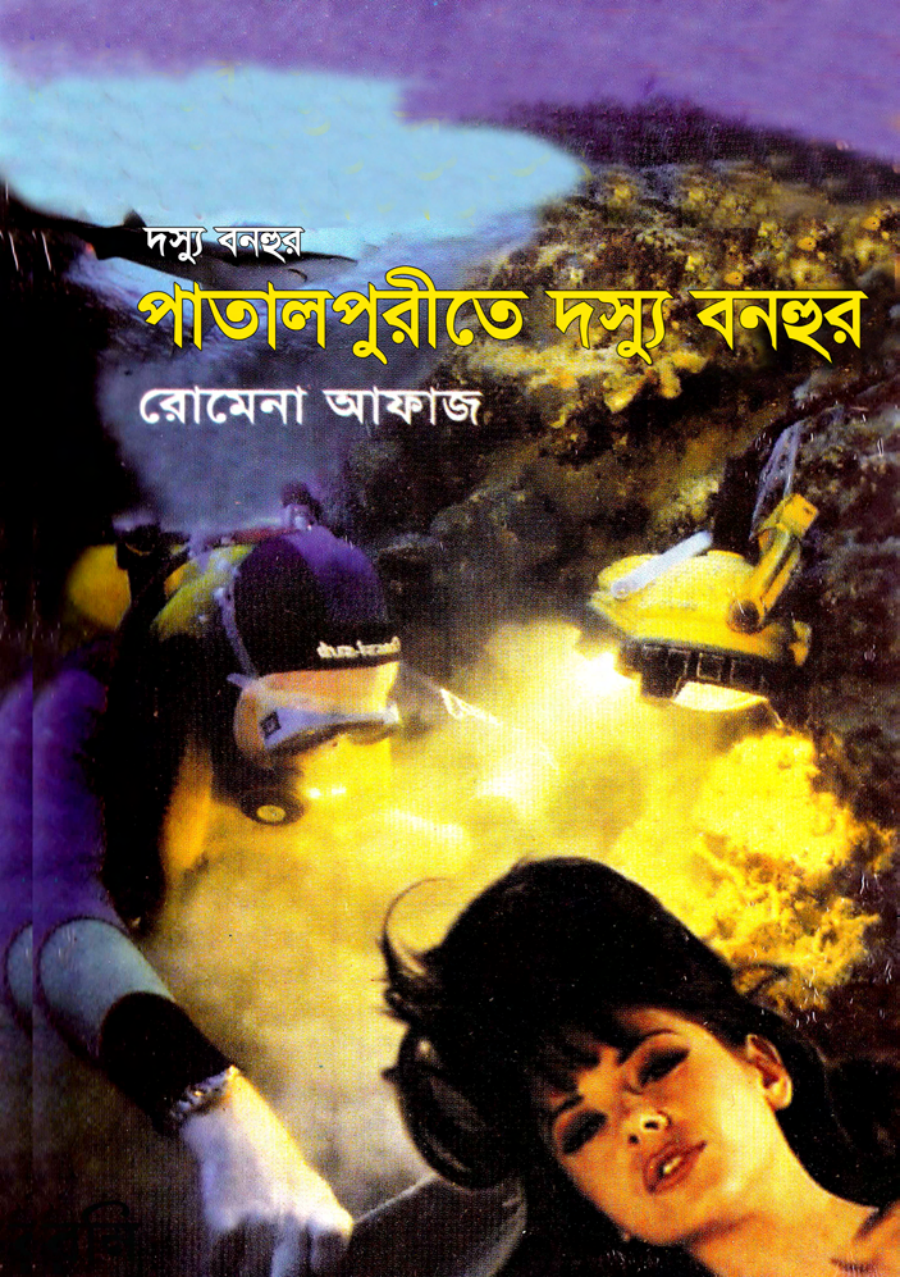
সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

নাইট ক্লাবের মালিক শ্যাম সিং হিংস্র জন্তুর মত গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুরের উপর।

বনহুর প্রস্তুত ছিলো, খপ্ করে শ্যাম সিং-এর ছোরাসহ হাতখানা ধরে ফেললো। সে কি অসীম শক্তি অগ্নিদগ্ধ শ্যাম সিং-এর পোড়া শরীরে।

চললো ধস্তাধস্তি।

নূরী যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে একেবারে, ভেবে পাচ্ছে না শয়তানটা সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্য হতে রক্ষা পেলো কি করে! সেদিনের সেই বিস্ফোরণ নূরী আজও ভুলতে পারেনি। ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিলো, আলো-ঝলমল বিরাট নাইট ক্লাবটা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিলো—ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো চারিদিক।

নূরী যেন পাথরের মূর্তি বনে গেছে।

শ্যাম সিং-এর পোড়া দেহের পঁচা দুর্গন্ধে কক্ষটার হাওয়া যেন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

বনহুর মরিয়া হয়ে উঠলো যেন।

নর শয়তান শ্যাম সিং দাঁতে দাঁত পিষে বললো—আমাকে তুই ধ্বংস করেছিস ভোলানাথ, তোকে হত্যা না কারে আমি মরবো না।

যে জায়গাটায় এখন লড়াই চলেছিলো সে জায়গাটা কান্দাই শহরের নিভৃত একটি বাড়ি। এখানে সেদিন কস্তুরীবাঈ-বেশিনি নূরীকে রেখে বনহুর কান্দাই আস্তানায় গিয়েছিলো। বনহুর কস্তুরীবাঈ-বেশিনি নূরীকে প্রথম দিনই চিনতে পেরেছিলো কিন্তু তাকে বুঝতে দেয়নি বা তার নাম ধরে ডাকেনি। বনহুর এ কারণেই কস্তুরীবাঈ-এর সঙ্গে গভীরভাবে মিশেছে।

সেদিন বনহুর যখন কস্তুরী-বাঈকে এ বাড়িতে রেখে বিদায় নিয়েছিলো তার কিছুক্ষণ পরই কস্তুরীবাঈ-এর বেশ ত্যাগ করে নূরী কায়েস সহ গোপন পথে কান্দাই আস্তানায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলো।

নূরী যখন কস্তুরীবাঈ-এর বেশে থাকতো তখন কায়েস সর্বক্ষণ তার পিতা নাথুরামের বেশে থাকতো তার পাশে পাশে।

অবশ্য ঐ দিন নূরী কায়েসকে সঙ্গে রাখেনি যেদিন দস্যু বনহুর নাইট ক্লাবের বারুদাগারে অগ্নি সংযোগ করেছিলো। নূরী জানতো, হয়তো বনহুর এবং তার মৃত্যুও হতে পারে।

বনহুর আর অগ্নিদগ্ধ যমদূত শ্যাম সিং ভীষণভাবে লড়াই করে চলেছে। শ্যাম সিং তার হাতের ছোরাখানা বনহুরের বুকে বসিয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। বনহুর ওর কবল থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নেবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।

সেকি ভীষণ উৎকট দুর্গন্ধ বের হচ্ছে শ্যামসিং-এর শরীর থেকে। নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। নূরী নাকে আঁচল চাপা দিতে বাধ্য হয়েছে। একপাশে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে সে।

শ্যামসিংকে ঠিক একটি বিকৃত আকার রাক্ষস বলে মনে হচ্ছে। একটা চোখ বারুদের আগুনে গলে গেছে। কপালের উপরের চামড়া ঝুলে নাকের উপর এসে জমা হয়েছে। গালটা পুড়ে কুঁকড়ে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে। ওকে এখন দেখলে অতি সাহসী লোকের প্রাণও শিউরে উঠবে।

এত পুড়ে যাওয়া সত্ত্বেও শ্যাম সিং-এর দেহের শক্তি একটুও কমেনি বরং আরও যেন বেড়েছে।

বনহুরকে ভূতলে ফেলে বুকের উপর বসে ছোরাখানা উদ্যত করে ধরলো, কঠিন হুঙ্কার গর্জন করে উঠলো— এবার তোকে খতম করবো... ... ...

নূরী এই মূহূর্তে কি করবে ভেবে স্থির করে নিলো। সে দেখলো, আর এক সেকেণ্ড—তাহলেই শ্যাম সিং-এর হাতের ছোরাখানা সমুখে বিদ্ধ হবে হুরের বুকে। চিরদিনের মত নিভে যাবে তার আশার স্বপ্ন, হুর আর তাকে

নূরী বলে ডাকবে না। তার গর্ভে যে আজ ওরই সন্তান—একটিবার হুর কি তার সন্তানকে দেখে যাবে না? নূরী ছুটে গিয়ে দ্রুত হস্তে তুলে নিলো ওপাশ থেকে লোহার রডখানা, তারপর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শ্যামসিং-এর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করলো।

শ্যাম সিং-এর ছোরাসহ হাতখানা বনহুরের বুকে নেমে আসবার পূর্বেই নূরীর রডের আঘাতে শ্যাম সিং-এর মাথাখানা দু'ফাঁক হয়ে গেলো। একটা শব্দ হলো শুধু বোম কিংবা বড় পট্‌কা ফাটার মত। পর মূহূর্তে শ্যামসিং-এর দেহটা ঢলে পড়লো বনহুরের পাশে।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর উঠে দাঁড়ালো, সে যেন হঠাৎ হতভম্ভ হয়ে পড়েছিলো। আজ বনহুর শ্যামসিং-এর হাতে প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিয়েছিলো, কারণ শ্যামসিং-এর আচমকা আক্রমণে এবং তাঁর দেহের পঁচা উৎকট দুর্গন্ধে বনহুর তার দেহের সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলো। তাছাড়াও বনহুর সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ছিলো সে সময়।

বনহুর উঠে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালো অগ্নিদগ্ধ শ্যামসিং-এর রক্তাক্ত মাথাটার দিকে। নূরীর হস্তস্থিত রডের আঘাতে ওর মাথাটা একেবারে দু'ফাক হয়ে গেছে। রক্ত আর ঘিলুতে মেঝেটা লালে লাল হয়ে উঠেছে। কয়েকটা ঝাঁকি দিয়ে নীরব হয়ে গেলো শ্যামসিং এর দেহটা।

নূরী ফিরে এসে বনহুরের বুকে মাথা রেখে বললো—হুর, কি ভয়ঙ্কর ঐ লোকটা! তোমাকে আর একটু হলে ও হত্যা করে ফেলতো।

বনহুর নূরীর মাথায় হাত রেখে বললো, নূরী— আজ তোমার জন্যই নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা পেলাম। কিন্তু আশ্চর্য, সেদিনের বিস্ফোরণের পর কি করে শ্যামসিং জীবিত থাকতে সক্ষম হয়েছে, সেটাই ভেবে পাচ্ছি না।

নূরী বললো— আমিও আশ্চর্য হচ্ছি হুর, ঐ সাংঘাতিক অগ্নিকাণ্ড আর বিস্ফোরণের মধ্যে কেউ কি জীবিত থাকতে পারে!

বনহুর আর নূরী বেশিক্ষণ এ কক্ষে বিলম্ব করে কিছু চিন্তা করবে তেমন উপায় ছিলো না, ওরা দু'জন সেই মূহূর্তে কক্ষ ত্যাগ করলো। কারণ, কক্ষটা শ্যামসিং-এর পোড়া মাংসের গন্ধে ভরে উঠেছিলো।

❑

বনহুর আর নূরী ফিরে এলো আস্তানায়।

নূরীর মনে আনন্দ উৎস বয়ে চলেছে। সে জানে, বনহুর কান্দাই রহস্য উদ্‌ঘাটন করার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। কিন্তু অবাক হলো নূরী, কান্দাই রহস্য উদ্‌ঘাটন হওয়া সত্ত্বেও বনহুর কেমন যেন ভাবাপন্ন, সর্বক্ষণ কি যেন চিন্তা করে সে।

একসময় বললো নূরী—হুর, তোমার কাজ শেষ হলো, তবু কেন অমন আনমনা হয়ে থাকো, বলতো?

বনহুর নূরীর কথায় একটু হেসে বললো—আমার কাজ শেষ হয়েছে, একথা তোমাকে কে বললো নূরী?

তুমি না বলেছিলে, কান্দাই রহস্য উদ্‌ঘাটন না করা পর্যন্ত তুমি নিশ্চিত নও?

হাঁ, বলেছিলাম।

তাহলে অমন আনমনা হয়ে কি ভাবো সারাক্ষণ?

কান্দাই রহস্য কি সম্পূর্ণ উদঘাটিত হয়েছে নূরী?

না। বহু কাজ এখনও বাকি। যাক্ ও সব কথা, এবার বলো, হয়নি? কবে কতদিন পরে তুমি মা হবে? আমি তোমার... ... ...

লজ্জায় দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলে নূরী।

বনহুর ওকে টেনে নেয় নিবিড় করে বুকের মধ্যে। মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলে— তোমার সন্তানের মুখে বাপু ডাক শুনার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে আছি নূরী।

যাও, কথা বলবো না।

আমি বলবো। একশোবার বলবো। নূরীর চিবুক ধরে মৃদু নাড়া দেয় বনহুর।

তুমি বড় দুষ্ট!

হাঁ, কিন্তু... ...

বলো?

শুধু তোমার কাছে। নইলে আমি খুব ভাল মানুষ, বুঝলে নূরী?

তা জানি। তোমার মত ভয়ঙ্কর বুঝি এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। শোনো হুর, একটি কথা রাখবে আমার?

একটা কেন, বলো, রাখার মত হলে সব কথাই রাখবো।

একটিবার মনিকে দেখতে চাই। কতদিন ওকে দেখিনি, দেখাবে?

বনহুর মূহূর্তের জন্য হতভম্ভ হয়ে যায়— হঠাৎ মনিকে দেখতে চাইবে নূরী, এ যেন সে ভাবতে পারেনি। বনহুর গম্ভীর হয়ে পড়ে ক্ষণিকের জন্য।

নূরী অভিমানভরা কণ্ঠে বলে— নারাজ হয়েছো তুমি!

না নূরী, নারাজ নয়।

তবে অমন গম্ভীর হয়ে পড়লে কেন?

ভাবছি ... ...

কি ভাবছো?

ভাবছি ওকে কেমনভাবে আনা যায়।

নূরী ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি হেসে বললো— তুমি আমাকে হাসালে হুর। তোমার অসাধ্য কিছু আছে নাকি?

কিন্তু... ...

কোনো কিন্তুই আমি শুনতে চাই না, তুমি বলো মনিকে আনবে কি না?

বললাম চেষ্টা করবো।

চেষ্টা করবো নয়— কথা দাও।

দিলাম।

সত্যি তুমি ... ...

কত ভাল— এইতো বলবে?

যাও!

না, সরে এসো নূরী, আরও কাছে সরে এসো।

কেই এসে পড়লে কি হবে বলো তো?

কি আর হবে! নিশ্চয়ই সরে যাবে।

তোমার যেন লজ্জা নেই!

লজ্জা! কিসের লজ্জা নূরী? তোমার-আমার যে সম্বন্ধ সে তো সবাই জানে। বনহুর মুখখানা তুলে ধরে নিজের মুখের কাছে।

নূরী স্বামীকে বাধা দেয় না, সে নিজেকে সমর্পণ করে তার বাহুবন্ধনে।

❑

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় মনিরার, চমকে বলে উঠে— কে, কে?

মনিরার মুখে হাতচাপা দেয় বনহুর— চুপ! আমি।

তুমি! তুমি এসেছো!

হাঁ মনিরা। কথাটা বলে বেড়সুইচ টিপে আলো জ্বালে বনহুর।

মনিরা শয্যায় উঠে বসে, গম্ভীর স্বরে বলে সে— ফুলমিয়াকে বেঁধে রেখে ওভাবে পালাবার কি প্রয়োজন ছিলো তোমার?

হেসে বলে বনহুর— প্রয়োজন ছিলো বলেই তো ওকে বেঁধে চলে গিয়েছিলাম। কারণ, ও আমার যাওয়ায় বাধা দিচ্ছিলো।

তাই বলে তুমি পালাবে.........

পালাইনি মনিরা, কাজে গিয়েছিলাম।

জানি, দস্যুতা ছাড়া কিইবা কাজ আছে তোমার? পরের অর্থ আর সম্পদে এতো লোভ তোমার!

লোভ আছে বলেই তো আমি মানুষ, না হলে পাথরের মূর্তি বনে যেতাম। যাক ও সব, কেমন আছো মনিরা? মা, নূর, ওরা কেমন আছে?

মনিরা পূর্বের ন্যায় গম্ভীর গলায় বললো— একটা দস্যুর মুখে এসব মানায় না। তোমার মুখে শোভা পাবে কার সর্বনাশ করে ধন-সম্পদ লুটে নেবে.........

মনিরা, আমি শুধু পরের সর্বনাশ নিয়েই মেতে থাকি?

তা নয় তো কি? তোমার প্রতিটা লোমকূপ সাক্ষী দেবে তোমার অপরাধের কথা।

বনহুর হাত জুড়ে মিনতিভরা গলায় বলে— মাফ করে দাও মনিরা।

বলো, আমাকে না বলে আর পালাবে না?

না, তোমাকে না বলে আর পালাবো না।

আমার গায়ে হাত রেখে বলো?

বললাম। বলে হাসে বনহুর।

মনিরাও হাসে।

বনহুর সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দেয়।

মনিরা বলে—একি করলে?

দস্যু বনহুর আলো সহ্য করতে পারে না, বুঝলে?

আবার দুষ্টামি শুরু করলে?

সত্যি, আমি বড্ড দুষ্ট, তাই না?

যাও, যাও বলছি........

বেশ যাচ্ছি। বনহুর মনিরার শয্যা ত্যাগ করে ওদিকের মুক্ত জানালার দিকে পা বাড়ালো।

মনিরার মনটা আচমকা ভড়কে গেলো— খেয়ালী লোক বনহুর—যদি সত্য চলে যায়! মনিরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেললো বনহুরের হাতখানা— যাও দেখি এবার।

কেন, যেতে পারবো না?

পারবে না।

সত্যি মনিরা, তোমার পাশে এসে আমার সব শক্তি আমি হারিয়ে ফেলি, জানি না তুমি আমায় কি যাদু করো।

মনিরাসহ ফিরে আসে বনহুর শূন্য শয্যায়।

কত কথা হয় ওদের দু'জনার মধ্যে।

একসময় রাত ভোর হয়ে আসে।

বনহুর বলে—মনিরা, একটা কথা বলবো?

এত কথা বললে তবু একটা কথা তোমার বলা হয়নি এখনও?

না মনিরা!

তবে বলো?

ভূমিকা না করে সোজা কথায় বলবো, না.........

থাক, ভূমিকার কোনো প্রয়োজন হবে না, তুমি সোজা কথায় বলো।

নূরকে আমি নিয়ে যেতে চাই!

মুহূর্তে মনিরা শয্যায় উঠে বসে, বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো— নূরকে তুমি নিয়ে যেতে চাও তোমার ওখানে?

হাঁ, শুধু একটি দিনের জন্য।

এতক্ষণে মনিরার দেহে যেন প্রাণ সঞ্চার হলো, বললো— হঠাৎ এ সখ চাপলো কেন, বলো তো?

কেন, সন্তান কি শুধু তোমার?

আমি কি সেই কথা বলছি? হঠাৎ কি মনে করে তুমি নূরকে তোমার ওখানে নিয়ে যেতে চাও?

বনহুর কি বলবে ভাবতে লাগলো।

মনিরা চাপা গলায় বললো— ওকেও তোমার মতো দস্যু বানাতে চাও বুঝি?

ছিঃ মনিরা, অমন কথা তুমি বলতে পারলে? জানো না মনিরা, নূরের উপর আমার কত ভরসা। সে লেখাপড়া শিখে মানুষের মত মানুষ হবে......কথাটা বলতে বলতে গলা ধরে আসে বনহুরের।

মনিরা বুঝতে পারে, স্বামী তার কথায় অন্তরে ব্যথা পেয়েছে। স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে বললো মনিরা— জানি! আমি তোমার সন্তানের কথা জানি। ওগো, তুমি নূরকে যেখানে খুশি নিয়ে যেও, আমি তোমাকে বারণ করবো না। নূর যে তোমার!

মনিরা, আমি জানি, সব জানি। কিন্তু রাত ভোর হবার পূর্বেই যে আমাকে যেতে হবে!

নূর যে ঘুমাচ্ছে।

তুমি যদি কিছু না মনে করো আমি ওকে ঘুমন্ত অবস্থায় নিয়ে যাবো।

কিন্তু... ...

বলো?

মামীমা জেগে যখন দেখবেন নূর নেই, তখন কি বলবো তাঁকে?

বলবে তুমি কিছু জানো না।

এতবড় মিথ্যা বলতে পারবো না আমি।

বেশ, আমি মাকে বলেই নিয়ে যাচ্ছি।

তা হয় না, মামীমা কিছুতেই এতরাতে ওকে তোমার হাতে ছেড়ে দেবেন না।

তবে তুমিই বলো কি করবো?

আমি ভেবে পাচ্ছি না কিছু।

নিজেদের সন্তান নিয়ে ওরা নিজেরাই ভেবে অস্থির হয়ে পড়লো। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলো। দূরে কোনো মসজিদ থেকে শোনা যায় আজানের শব্দ।

মনিরা বলে— আর একটু অপেক্ষা করো, নূর এক্ষুণি জেগে উঠবে......

তার সঙ্গে জেগে উঠবে তোমার মামীমা, তারপর বাস্— ওকে নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, নিজেই আটকে পড়বো চৌধুরী বাড়ির পাযাণ প্রাচীরের আবেষ্টনিতে। কিন্তু ভাবছি, কি করে দিনের আলোতে এ বাড়ির বাইরে পা বাড়াবো?

আজকের দিনটা নাইবা গেলে? থেকে যাওনা একটি দিন?

তাহলে তুমি খুশি হও?

শুধু আমি নই, এ বাড়ির সবাই যে কত খুশি হবে, তাকি তুমি জানো না।

মনিরার অনুরোধ ফেলতে পারে না বনহুর, সে থাকবে বলে কথা দেয়।

রাত ভোর হয়ে আসে।

জেগে উঠেন মরিয়ম বেগম, ফজরের নামাজ শেষ করে তিনি মোনাজাত করছিলেন, এমন সময় মনিরা কক্ষে প্রবেশ করে বলে— মামীমা, ও এসেছে!

মরিয়ম বেগমের মুখখানা মূহূর্তে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তিনি মুনাজাত শেষ করে উচ্ছল কণ্ঠে বললেন— আমার মনির এসেছে?

হাঁ মা।

কোথায়? কোথায় সে?

এই যে মা আমি......বলতে বলতে বনহুর মনিরার পিছনে দাঁড়ায়। মায়ের কদমবুসি করে সে উবু হয়।

মা প্রাণভরে আশির্বাদ করেন।

বনহুর লক্ষ্মী ছেলের মতো মায়ের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বলে— মা, কেমন আছো?

আমাকে তো দেখতেই পাচ্ছিস। তুই কেমন আছিস বাবা! বড্ড রোগা লাগছে তোকে।

মায়ের চোখে সন্তান সব সময় রোগা লাগে। যাক, কেন এসেছি তাতো জিজ্ঞাসা করলে না মা?

জানি নূরকে দেখতে এসেছিস।

না, ওকে এবার নিয়ে যাবো বলে এসেছি।

সে কিরে......

চমকে উঠলো মা। তোমার নাতিকে একেবারে নিয়ে যাবো না। শুধু একটি দিনের জন্য......

কেন বাবা, হঠাৎ কি মনে করে ওকে আবার নিয়ে যেতে চাস্?

পরে বলবো না! না হয় ওর মুখেই শুনো।

বেশ! নূর নূর, দেখ্ দাদু কে এসেছে! মরিয়ম বেগম জায়নামাজ ত্যাগ করে নূরের শয্যার দিকে এগুলেন।

বনহুর চুপ করে সরে পড়লো, সন্তানের সঙ্গে একটু তামাশা করতে ইচ্ছা হলো তার।

মরিয়ম বেগমের ডাকে জেগে উঠলো নূর, গা মোড়া দিয়ে শয্যায় উঠে বসলো সে।

নূর বিছানায় উঠে বসতেই বনহুর পিছন থেকে ওর চোখ দুটো ধরে ফেললো।

মনিরা হাসছিলো।

মরিয়ম বেগম বললো—দাদু, কে এসেছে বলো তো?

নূর তার কচি হাত দিয়ে বনহুরের বলিষ্ঠ হাত দু'খানা স্পর্শ করে আনন্দভরা কণ্ঠে বলে উঠে—আব্বু!

খিল খিল করে হেসে উঠে মনিরা, বলে—দেখলে, আমার নূর কত চালাক! তোমার হাত স্পর্শ করেই সে বলে দিলো কে তুমি।

মরিয়ম বেগম খুশি হয়ে উঠলেন, বললেন তিনি—ঠিক বলেছিস দাদু, তোর জিত হয়েছে।

বনহুর ততক্ষণে নূরকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আদর করতে শুরু করেছে।

নূর তো আনন্দে আত্মহারা, দু'হাতে পিতার গলা জড়িয়ে ধরে বলে—আব্বু, কখন এলে তুমি?

এই তো অল্পক্ষণহলো এসেছি আব্বু, তুমি যখন ঘুমাচ্ছিলে।

আব্বু, এবার আর তোমাকে যেতে দেবো না।

মরিয়ম বেগম বলেন—এবার তোর আব্বুর পায়ে লোহার শিকল আটকে ঘরে বন্দী করে রাখবি দাদু।

মনিরা মামীমার কথায় হেসে বলে—মামীমা, তোমার ছেলেকে লোহার শিকল পরালেও আটকে রাখা যায় না। শিকল ছিঁড়ে পালাতে ওস্তাদ......।

❑

গোটা দিনটা আনন্দের মধ্য দিয়ে কেটে যায়। মনিরা স্বামীর পাশে সর্বক্ষণ ছায়ার মত রইলো। স্বামীকে পাশে পাওয়া তার নারী-জীবনের পরম

এক মূহূর্ত— মনিরা এ সময়গুলো বিফলে যেতে দেয় না। নানা কথা, নানা হাসি-গল্পের মধ্য দিয়ে কাটায় সে দিনটা।

মরিয়ম বেগম তো রান্নাঘরে বাবুর্চির সঙ্গে যোগ দিয়ে বসেছেন— কি রাঁধবেন, কি খাওয়াবেন ভেবে যেন অস্থির তিনি। পোলাও কোরমা থেকে শুরু করে জরদা-ফিরনি, ছানা-সন্দেশ পর্যন্ত নিজ হাতে তৈরি করে চললেন।

খেতে বসে অবাক হলো বনহুর, তার সম্মুখস্থ টেবিলটায় এতটুকু জায়গা নেই যেখানে আর একটা বাটি ধরবে। একরাশ খাবারের মধ্যে বনহুর যেন ডুবে গেলো একেবারে। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো— মা, একি সর্বনাশ করেছো!

সর্বনাশ! কিসের সর্বনাশ করলাম?

এমন সময় মনিরা সেই কক্ষে প্রবেশ করে, বনহুর তাকে লক্ষ্য করে বলে— মনিরা, দেখো মা কি করেছেন। এটা সর্বনেশে ব্যাপার নয়?

মনিরা হেসে বলে— এবার সব খেয়ে সর্বনাশটা থেকে উদ্ধার করো মামীমাকে, বুঝলে?

এত খাবো কি করে?

খেতে হবে। বললো মনিরা।

মরিয়ম বেগম বললেন— কতদিন তোকে খাওয়াইনি! খেয়ে নে বাবা......খাবার প্লেট এগিয়ে দেন তিনি পুত্রের দিকে।

বনহুর নূরসহ খেতে বসে যায়।

ক'টা খাবে সে— তবু যা পারে গোগ্রাসে খায়।

মরিয়ম বেগম নিজ হাতে পরিবেশন করে খাওয়াতে লাগলেন।

খেতে খেতে বললো বনহুর— নূর, আমার সঙ্গে যাবে?

কোথায়?

আমি যেখানে থাকি?

যাবো। সত্যি তুমি আমায় নিয়ে যাবে আব্বু?

হাঁ, তোমাকে নিয়ে যাবো বলেই এসেছি।

আনন্দে অধীর হয়ে উঠে নূর। কতদিন সে তার আব্বুর সঙ্গে যেতে চেয়েছে তবু তাকে নিয়ে যায়নি, আর আজ নিজের মুখে তাকে নিয়ে যাবে বলছে তার আব্বু— এ যে নূরের পরম আনন্দের কথা।

কথাটা শোনার পর থেকে সব সময় নূর বনহুরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো, কখন তাকে নিয়ে যাবে তার আব্বু, এ নিয়ে যেন উতলা হয়ে উঠলো সে। বারবার পিতাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললো। আব্বু, কখন যাবে বলো না? তোমার ঘোড়াটা কিন্তু আমার খুব ভালো লেগেছিলো.....

চমকে উঠে বনহুর পুত্রের কথায়, অস্ফুট কণ্ঠে বলে— আমার ঘোড়া? আমার ঘোড়া কোথায় দেখলে আব্বু?

এরি মধ্যে তুমি ভুলে গেলে? ঐ যে যেদিন তুমি চাঁদ সেজে আমাকে ডাকাতের হাত থেকে উদ্ধার করে তোমার ঘোড়ার পিঠে চেপে আম্মির কাছে নিয়ে এলে......

ও, বুঝেছি! বনহুরের সব কথা মনে পড়ে গেলো। এতটুকু ছেলে, সে-ই কতদিন আগের কথা সব স্মরণ রেখেছে! বনহুরের মুখে একটা চিন্তার ছায়া ঘনিয়ে এলো। সে চেয়েছিলো, নূরের কাছে সেই শুধু আত্মগোপন করে থাকবে না, তার সব কিছুই গোপন থাকবে; তার প্রিয় অশ্ব তাজকেও সে নূরের কাছে প্রকাশ করতে চায় না। কারণ, নূর বড় হয়ে যখন জানতে পারবে— দস্যু বনহুরের অশ্বের রং জমকালো আর অত্যন্ত তেজী তখন হয়তো মনে সন্দেহ জাগতে পারে। তাই বনহুর নূরের মুখে তার তাজের কথা শুনে শুধু চমকেই উঠেনি, আঁতকে উঠেছিলো সে অজানিত এক আশঙ্কায়।

নূর তার আব্বুকে অন্যমনস্ক হতে দেখে বললো— আব্বু, কি ভাবছো?

এ্যা কি বললে, কি ভাবছি?

হাঁ, কি ভাবছো তুমি?

ভাবছি......

ঐ ঘোড়ার কথা ভাবছো বুঝি?

হাঁ বাবা।

কেন, ঘোড়াটা তোমার না?

ঠিক বলেছো নূর, ওটা আমার ঘোড়া নয়।

তবে কার ঘোড়া?

পথ দিয়ে আসছিলাম, তখন বনের ধারে ঐ ঘোড়াটা দেখতে পেয়ে আমি চেপে......

চেপে এদিকে আসছিলে বুঝি?

হাঁ, হাঁ আব্বু। যাও, তুমি মায়ের কাছে গিয়ে তৈরি হয়ে নাও গে, যাও। যাবার সময় হয়েছে।

এখন আমায় নিয়ে যাবে তো?

হাঁ আব্বু।

নূর খুশিতে উচ্ছল হয়ে ছুটে যায় মায়ের কাছে।

বনহুর ভাবতে থাকে, কিভাবে নূরকে নিয়ে যাবে সে তার আস্তানায়। এখন সে পূর্বের মত ছোট্ট নেই, সব সে বুঝতে বা জানতে শিখেছে।

❑

পিছন আসনে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে নূর। চোখে-মুখে ওর আনন্দদ্যুতি খেলা করছে। বনহুরকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে ও।

বনহুর ড্রাইভ করতে করতে পুত্রের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলো, সম্মুখে তার দৃষ্টি।

কান্দাই শহর ছেড়ে এবার নির্জন পথ ধরে গাড়ি ছুটতে থাকে। দু'পাশে শুধু শাল আর দেবদারু গাছ। মাঝে কোথাও কোথাও মেহগনি আর অশ্বত্থ গাছ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

এতক্ষণ বনহুর একমনে গাড়ি চালিয়ে চলেছিলো, এবার নির্জন পথে গাড়ি চালাতে গিয়ে মনের মধ্যে নানারকম চিন্তার উদ্ভব হতে থাকে তার।

কি যেন ভাবছে বনহুর নিতান্ত মনোযোগের সঙ্গে। নূরের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে বনহুর।

আব্বু, তুমি এত দূরে থাকো?

এ্যা, কি বললে নূর?

শহর ছেড়ে আরও দূরে যাবে?

হাঁ— না না, আর বেশি নয়। একটু এগিয়ে গাড়ির স্পীড কমিয়ে দেয় বনহুর, বলে সে— নূর, তোমার ঘুম পাচ্ছে না?

না, একটুও ঘুম পাচ্ছে না আব্বু। বলোনা আর কতটা পথ যেতে হবে?

এইতো এসে গেছি প্রায়......

কই, বাড়িঘর এসব তো কিছু নেই এদিকে?

এ্যাঁ, তাইতো! হুঁ...

কি ভাবছো আব্বু?

বনহুর বলে— নূর, ঐ দেখো, ঐ যে নিল পাহাড়টা দেখছো ওখানে কি থাকে জানো?

কি থাকে? কি থাকে বলোনা আব্বু?

না না, কিছু না?। ও কিছু না। আচ্ছা নূর, কিছু খাবে তুমি?

নূর ছোট্ট হলেও সে একেবারে অবুঝ নয়, তার আব্বুকে হঠাৎ আনমনা এবং পরে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হতে দেখে অবাক না হয়ে পারে না। বলে নূর— আব্বু, তুমি অমন করছো কেন?

কই— কই কেমন করছি?

স্বয়ং দস্যু বনহুর এতটুকু ছেলের কাছে কেমন যেন হাবা বনে গেছে। তাড়াতাড়ি গাড়ির মধ্যে ঝুড়ি থেকে কয়েকটা ফল এবং বিস্কুট বের করে রাখলো নূরের সম্মুখে— খাও।

তুমিও খাও তবে।

নূরকে নিয়ে আসবার সময় মনিরা একটা ঝুড়ির মধ্যে কিছু ফলমূল আর কেক-বিস্কুট দিয়েছিলো যত্ন করে, কারণ ছোট্ট ছেলে নূর, পথে ক্ষুধা পেলে কান্নাকাটি করতে পারে। নূরের কথায় বনহুর বললো— আমিও খাবো,

তুমি আগে খেয়ে নাও।–বাঃ খাও, খেয়ে পানি খাও। বোতল থেকে এক গেলাস পানি বের করে পাশে রেখে বললো আবার— আমি ততক্ষণে গাড়ির ইঞ্জিনটা পরীক্ষা করে দেখেনি, কেমন?

নূর খেতে খেতে মাথা কাৎ করে বললো—যাও।

বনহুর গাড়ির সম্মুখে গিয়ে ইঞ্জিনের ঢাকনা খুলে ফেলে ঝুঁকে পড়লো তার মধ্যে, কিন্তু পকেট থেকে বের করে নিলো একখানা রুমাল আর ছোট্ট শিশি। শিশি থেকে কয়েক ফোঁটা তরল পদার্থ রুমালে মাখিয়ে ফিরে এলো গাড়ির পাশে।

নূরের খাওয়া হয়ে গিয়েছিলো, বললো— আব্বু, এবার তুমি খাও।

হাঁ, আমিও খাবো আব্বু। এসো, তোমার মুখটা মুছে দিই।

বনহুরের দিকে নূর মুখটা বাড়িয়ে দিলো অনায়াসে।

বনহুর রুমালে পুত্রের মুখ মুছে দিতেই তার হাতের উপর ঢলে পড়লো ওর সংজ্ঞাহীন কচি দেহখানা। বনহুর রুমালটা এবার পকেটে রেখে নূরকে যত্ন সহকারে শুইয়ে দিলো পিছন আসনে। তারপর ড্রাইভিং আসনে চেপে বসলো।

গাড়ি আবার স্পীড়ে ছুটে চললো।

দু'ধারে বন আর মাঝে কাঁকর বিছানো প্রশস্ত পথ

একদিন এ পথ ছিলো কান্দাই শহরের সবচেয়ে দীর্ঘ সুন্দর এবং সেরা পথ। এ পথেই দূর-দূরান্ত হতে রাজা-মহারাজাগণ আসা-যাওয়া করতেন। দেশ-দেশান্তর থেকে আসতো সওদাগর আর মহাজনগণ নানারকম সওদা নিয়ে। কত রকম ব্যবসা-বাণিজ্যের আদান-প্রদান চলতো এই পথ দিয়ে, কিন্তু আজকাল বড় কেউ এ পথে চলাচল করে না। দস্যু কালু খাঁর সময় থেকে এ পথ নির্জন হয়ে গেছে। নিতান্ত প্রয়োজন হলে কেউ কোনো সময় যাওয়া-আসা করে থাকে। তবু নানারকম আঁতঙ্ক আর উৎকণ্ঠা নিয়েই চলে তারা। কতকটা জীবন হাতে নিয়েই চলে।

এ পথ এখন দস্যু বনহুরের আয়ত্তসীমার মধ্যে। বহু চেষ্টা করেও পুলিশ মহল বা গোয়েন্দা বিভাগ পারেনি এ পথ পুণঃ চালু করতে।

দস্যু বনহুরের সঙ্গে মাঝে মাঝে এ পথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে যায় কারো— কিন্তু তারা ভদ্র, সম্ভ্রান্ত রাজা-মহারাজা নন, সওদাগর নন, কোনো ভয়ঙ্কর দস্যু কিংবা নর শয়তানের। যদিও তারা জানতো, কান্দাই জঙ্গলের আশেপাশে যাওয়া তাদের পক্ষে নিরাপদ নয় তবু দুঃসাহস নিয়েই আসতো এবং বনহুরের হাতে হয় নিহত, নয় আহত হয়ে পালাতো।

মনসুর ডাকুর মত দুর্দান্ত ডাকু কমই ছিলো। আজ মনসুর ডাকু পর্যন্ত বন্দী হয়ে রয়েছে দস্যু বনহুরের কারাকক্ষে। বনহুর নিজে বিচার করবে, তারপর হয় মুক্তি নয় মৃত্যু হবে তার। শুধু মনসুর ডাকুই নয়, তার বেশ কিছুসংখ্যক অনুচরও বন্দী আছে।

আজ বনহুর নিজ সন্তানকে চোরের দুর্বল মন নিয়ে তাকে সংজ্ঞাহীন করে নিয়ে চলেছে নিজ আস্তানায়। সন্ধ্যা যদিও এখনও হয়নি, তবু বেলা শেষ হয়ে এসেছে।

গাড়িখানা এখন শহর ছেড়ে বহুদূরে কান্দাই জঙ্গলের নিকটে এসে পৌঁছে গেলো। গাড়ি রাখতেই তাজের লাগাম ধরে এগিয়ে এলো রহমান। আধো অন্ধকারে সর্দারকে কুর্ণিশ জানিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

বনহুর গাড়ি থেকে নেমে বললো—নূর ঘুমিয়ে পড়েছে। নিজ সহচরের নিকটে বনহুর মিথ্যা কথা বললো। কারণ নিজ সন্তানকে অজ্ঞান করার কথাটা বলতে জিহ্বায় বাধলো তার।

রহমান পিছন আসন থেকে অতি যত্ন সহকারে নূরকে কোলে তুলে নিলো।

বনহুর তাজের পিঠে চেপে বসলো।

রহমান নূরকে প্রভুর কোলে তুলে দিয়ে পুনরায় কুর্ণিশ জানালো।

বনহুর নূরকে অতি সাবধানে বুকের মধ্যে চেপে ধরে তাজের লাগাম এঁটে ধরলো। তাজ ছুটতে শুরু করলো। রহমান এগিয়ে গেলো গাড়িখানার দিকে, শিস্ দিলো গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো কয়েকজন রাইফেলধারী দস্যু।

রহমান তাদেরকে লক্ষ্য করে বললো— তোমরা দূর থেকে সর্দারকে অনুসরণ করবে। তার কোলে আছে নূর। খোদা না করুন কোনো বিপদ এলে নূরের কোনো ক্ষতি যেন না হয়। যাও তোমরা।

রহমানের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেকে যার যার অশ্বে চেপে বসলো, তারপর দূর থেকে তারা সর্দারকে অনুসরণ করে এগিয়ে চললো।

সবাই দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো গাড়িতে চেপে বসলো রহমান।

নূরকে কোলে করে নূরীর পাশে এসে দাঁড়ালো বনহুর। নূরী ওদিকে মুখ ফিরিয়ে কোনো কাজ করছিলো, পিছন থেকে ডাকলো বনহুর—নূরী!

চমকে ফিরে তাকালো নূরী— কে? তুমি এসেছো! নূরকে বনহুরের কোলে দেখে আনন্দে আত্নহারা হয়ে ছুটে গেলো, দু'হাত বাড়িয়ে বললো— আমার মনিকে এনেছো?

হাঁ নূরী।

ও ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি?

হাঁ। ওকে বিছানায় শুইয়ে দাও।

নূরী বনহুরের কোল থেকে নূরকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগলো। নূর এখন বেশ বড় হয়েছে, কাজেই বেশিক্ষণ নূরী ওকে কোলে রাখতে পারলো না। শয্যায় শুইয়ে দিয়ে নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকালো নূরের মুখের দিকে, চোখেমুখে তার বিস্ময় ও আনন্দের উচ্ছ্বাস! উচ্ছল কণ্ঠে বললো— কত বড় হয়ে গেছে আমার মনি। ওর গায়ে মাথায়-কপালে হাত বুলিয়ে চললো নূরী। দক্ষিণ হাতের জামা তুলে ধরতেই বাজুতে সেই চিহ্ন বেরিয়ে পড়লো। নূরী বাম হাতে বনহুরের জামার, হাতা তুলে ধরে হাসলো কারণ বনহুরের বাজুতেও ঠিক একই রকম চিহ্ন ছিলো।

বনহুর হাসলো—কি দেখছো নূরী?

নূরী বললো— দেখছি বাপ-বেটার প্রতীক। আচ্ছা হুর, মনি এত ঘুমুচ্ছে কেন বলো তো?

নূরী, ওকে ঘুমাতে দাও। ও যতক্ষণ ঘুমাবে ততক্ষণই তুমি ওকে দেখতে পাবে, তারপর.........

তারপর ওকে আমি দেখতে পাবো না?

না।

মলিন মুখে বলে উঠে নূরী—কেন?

কারণ, তোমার মনি এখন ছোট্টটি নেই, সে এখানে যা দেখবে সব বলবে গিয়ে তার মায়ের কাছে— কাজেই বুঝতে পারছো......

ও, তাই তুমি......

হাঁ, আমি ইচ্ছে করেই তোমার মনিকে সংজ্ঞাহীন করে তবে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি।

কি নিষ্ঠুর তুমি! কথাটা বলে নূরী নূরের ঠোঁটে-গালে চুমুর পর চুমু দিতে থাকে।

নিজের হাতে নূরকে সুন্দর করে সাজিয়ে দেয় নূরী। কপালে চন্দনের ফোঁটা, কানে বালা, হাতে বালা, গলায় মূল্যবান মুক্তার হার। অপূর্ব লাগছে নূরকে, নিষ্পলক নয়নে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নূরী আর বনহুর।

বনহুর বলে—নূরী, এবার ওকে বিদায় দাও।

সেকি, এখুনি নিয়ে যাবে?

হাঁ, ওর জ্ঞান ফিরে আসবার পূর্বেই ওকে এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে নূরী।

আমি ওকে কিছু খাওয়াতে পারবো না?

তা কি করে হয়!

না না, আমি কিছুতেই মনিকে যেতে দেবো না, ওর জন্য আমি নিজের হাতে খাবার তৈরি করে রেখেছি।

বনহুর মাথা চুলকায়; সে বুঝতে পারে, নূরী ওকে না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বে না।

হেসে বললো নূরী—তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। ওর জ্ঞান ফিরে এলে আমি সরে থাকবো। হুর, তুমি ওকে খাওয়াবে, আমি আড়াল থেকে দেখবো।

এরপর বনহুর কথা বলতে পারে না, সে রাজি হয়।

নূরের সংজ্ঞা ফিরে আসবার পূর্বেই নূরী নানা রকম খাবার এনে টেবিলে সাজিয়ে রাখে। বারবার চুমু দিয়ে রাঙা করে তোলে ওর ঠোঁট দু'খানা।

বনহুর নির্বাক নয়নে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। একসময় বলে বনহুর— নূরী, আর কিছুদিন অপেক্ষা করো, দেখবে মনির মতই আর একটি মনি আসবে তোমার কোল জুড়ে........

যাও, লজ্জা নেই তোমার!

বলো তো ছেলে না মেয়ে হবে?

নূরী লজ্জায় মুখ নত করে নিলো—তুমিই বলো?

আচ্ছা, আমিই বলছি— ছেলে হবে।

না, আমি বলছি মেয়ে........

উঁ হুঁ ছেলে হবে।

উঁ হুঁ মেয়ে......

নূরী, যদি ছেলে হয় তবে আমার জিত আর যদি মেয়ে হয় তবে তোমার জিত হবে। কিন্তু একটা কথা খেয়াল রাখবে নূরী, ছেলে হলে আমি তাকে আমার মনের মত করে গড়ে তুলবো .....

নূরী বলে উঠলো— আর মেয়ে হলে আমি তাকে আমার ইচ্ছামত গড়ে নেবো।

বেশ, সেই কথা রইলো।

নূরী একটু ভেবে বললো— ছেলে হলে তার নাম আমি দেবো। মেয়ের নাম দেবে তুমি........

বেশ, তুমি যা বলো তাই হবে। তবে ছেলের নাম আমার মনের মত হওয়া চাই।

নূরী বলে উঠে—মেয়ের নামও আমার মনের মত হতে হবে, বুঝলে? কথাটা বলে নূরী বনহুরের নাকটা ধরে টিপে দিলো।

হেসে বললো বনহুর— শুনি কি নাম দেবে আমার ছেলের?

তুমি আগে বলো কি নাম রাখবে আমার মেয়ের?

বলবো?

হুঁ বলো?

ফুল্লরা! বলো কত সুন্দর নাম ফুল্লরা, তাই না?

আচ্ছা, আমি এবার তোমার ছেলের নাম বলছি। বললো নূরী।

বনহুর নূরীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বললো— সুন্দর না হলে শাস্তি পেতে হবে কিন্তু!

আচ্ছা! নূরী একটু ভেবে বললো— ছেলের নাম হবে জাভেদ চৌধুরী.........

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো বনহুর.....হাঃ হাঃ হাঃ জাভেদ...... হাঃ হাঃ হাঃ কি চমৎকার নাম— দস্যু জাভেদ.....হাঃ হাঃ হাঃ........বনহুরের হাসি যেন থামতে চায় না।

নূরী অবাক হয়ে বলে ওঠে— এ তুমি কি বলছো হুর?

হাঁ, সত্যি বলছি, নূরুজ্জামান চৌধুরীর ভাই দস্যু জাভেদ চৌধুরী... কি সুন্দর নাম! নূরী, তোমার সন্তান হবে দস্যু বনহুরের সন্তান দস্যু জাভেদ......একটু থেমে পুনরায় বললো বনহুর— একদিন দস্যু বনহুরের আঁতঙ্কে আঁতঙ্কিত নর শয়তানের দল যেমন কেঁচোর মত কুঁকড়ে থাকতো, তেমনি দস্যু জাভেদের ভয়ে একদিন প্রকম্পিত হয়ে উঠবে সারা পৃথিবী... ..... হাঃ হাঃ হাঃ দস্যু জাভেদ... ... দস্যু জাভেদ... ...

না না, আমার ছেলে দস্যু হবে না হুর, ওকে আমি দস্যু হতে দেবো না।

পারবে না নূরী, পারবে না ওকে রুখতে। দস্যু বনহুরের রক্ত আছে ওর মধ্যে ... ...

ঠিক সেই মুহূর্তে একটু নড়ে উঠে নূর।

নূরী বলে— সংজ্ঞা ফিরে এসেছে।

বনহুর ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠলো—তুমি আড়ালে যাও নূরী।

নূরী আড়ালে সরে গেলো।

বনহুর পাশে বসে নূরের কপালে হাত বুলিয়ে ডাকলো—আব্বু, আব্বু ঘুম হলো?

তখনও মাথাটা বুঝি ঝিম্ ঝিম্ করছিলো নূরের, চোখ দুটো আধো বন্ধ করে বললো— পানি খাবো।

পানি খাবে?

হাঁ আব্বু।

বনহুর টেবিল থেকে দুধের গেলাস নিয়ে নূরের মুখে ধরলো— খাও।

নূর একটু খেয়ে বললো— আর খাবো না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নূর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো।

বনহুরের ইচ্ছা ছিলো নূরের সংজ্ঞা ফিরে আসার পূর্বেই তাকে আস্তানার বাইরে নিয়ে যাবে কিন্তু নূরীর সঙ্গে কথায় কথায় কখন যে অনেকটা সময় চলে গেছে, মোটেই খেয়াল ছিলো না তার। এখন একটু বিব্রত বোধ করলো বনহুর, কারণ নূর তার আস্তানা দেখলে নানারকম প্রশ্ন করে বসবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অগত্যা, বনহুর নিরুপায় হয়েই নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে নিলো। বললো— নূর, কত ঘুমালে, না?

হাই তুলে বললো নূর—অনেক ঘুমিয়েছি, তাই না আব্বু?

হাঁ, অনেক ঘুমিয়েছো। এখন বেশ ক্ষুধা পেয়েছে, তাই না? এই দেখো কত খাবার খাও দেখি আব্বু।

বনহুর নূরের সম্মুখে খাবারগুলো এগিয়ে ধরলো।

নূর খেতে লাগলো।

নূরী আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে দেখতে লাগলো ওকে। দৃষ্টি যেন সরছে না তার।

নূর কি বেশিক্ষণ চুপ থাকবার ছেলে, খাবার খেয়ে ছুটোছুটি করে দিলো।

বনহুর বললো— আব্বু, বাইরে যাবে না, বুঝলে?

কেন?

অনেক রকম জন্তু আছে, কামড়ে দেবে।

জন্তু? আমি জন্তু দেখবো।

এবার বনহুর বিপদে পড়লো, জন্তু সে দেখাবে কোথা থেকে! বাইরে তার অনুচরদের দেখলে ওর কচি মনে নানা প্রশ্নের উদ্ভব হবে। বনহুর বললো— নূর, একটু বিলম্ব করো, তোমাকে নিয়ে শিকারে যাবো। জন্তু মেরে দেবো......

সত্যি বলছো আব্বু, জন্তু মেরে দেবে?

হাঁ, কি জন্তু চাও বলো— বাঘ না ভল্লুক?

ওসব নিয়ে কি করবো, আম্মির জন্য হরিণ দেবে আব্বু?

হরিণ নেবে? দেবো, একটু অপেক্ষা করো, আমি এক্ষুণি আসছি। নূরকে বসিয়ে রেখে চলে যায় বনহুর।

বনহুর বেরিয়ে যেতেই নূর চুপি চুপি অনুসরণ করে তাকে। আড়ালে আত্মগোপন করে এগিয়ে যায় সে পিতার পিছু পিছু।

বনহুর বাইরে বেরিয়ে আসতেই নূরী ওর জামার আস্তিন চেপে ধরে ব্যস্তকণ্ঠে বলে— নূর কি বলছে?

বলছে হরিণ নেবে।

বেশ, একটা হরিণ ওকে ধরে দিও। ওকে খাইয়েছো তো?

হাঁ খেয়েছে। শোনো, নূর বাইরে আসবে, দেখবে সব। তুমি সবাইকে সাবধান করে দাও, কেউ যেন তার সম্মুখে না আসে।

যাও, আমি সব ঠিক করে নেবো।

বনহুর আর নূরী যখন কথা বলছিলো নূর তখন আড়ালে দাঁড়িয়ে চুপ করে সব দেখলো আর শুনে নিলো, তারপর এক ছুটে পূর্বের জায়গায় এসে চুপটি করে বসলো।

বনহুর বললো— নূর, চলো, প্রথমে স্নান করে নেইগে!

চলো আব্বু। নূর পিতার হাত ধরে শয্যা থেকে নেমে দাঁড়ায়। তার আব্বু যেন বুঝতে না পারে সে এত উঁচু খাট থেকে নামতে পারে বা পেরেছিলো।

নূর নির্চে নেমে এগিয়ে গেলো আয়নার পাশে, নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে বললো— আব্বু, আমাকে এমন করে কে সাজিয়ে দিয়েছিলো, তুমি বুঝি?

হাঁ, আমি তোমায় সাজিয়ে দিয়েছি।

যখন আমি ঘুমিয়েছিলাম তখন বুঝি?

হাঁ।

এ হার আমাকে দিয়েছো আব্বু? খুব সুন্দর হার! আম্মি দেখলে অনেক খুশি হবে। নূর নিজের গলার হারছড়া উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলো।

বনহুর হেসে বললো— আরও হার নেবে?

নেবো।

আচ্ছা, আরও হার তোমাকে দেবো। সুন্দর সুন্দর হার নেবে কেমন, চলো এবার স্নান করতে যাই?

চলো। আব্বু, কি সুন্দর এ ঘরটা— এটা বুঝি তোমার ঘর?

হাঁ।

নূর অবাক হয়ে ঘরটার চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। জমকালো পাথরে তৈরি অদ্ভুত ঘরটা। একপাশে পাথরের টেবিল, টেবিলে সামুদ্রিক ঝাড় সাজানো। দেয়ালে দস্যু কালু খাঁর একটি তৈলচিত্র।

নূর কালু খাঁর ভীষণ চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকে বিস্ময়ভরা চোখে।

বনহুর তাড়াতাড়ি ওকে টেনে নেয়— চলো, আর দেরী করোনা। আবার ফিরে যেতে হবে তো তোমার মায়ের কাছে।

নূর কিন্তু এত সহজে ভুলবার ছেলে নয়। সে বুঝতে পারে, আব্বু ঐ ভীষণ চেহারার ছবিটা তাকে দেখতে দিতে রাজি নয়। তাই বলে নূর— আব্বু, ওটা কার ছবি?

ওটা ... ওটা আমার ওস্তাদের ছবি ...

ওস্তাদ? সে আবার কে ?

তোমার আম্মিকে জিজ্ঞাসা করো, কেমন? এবার চলো যাই। হরিণ নেবে না?

হরিণ, নেবো। হার নেবো ... ...

বেশ বেশ, চলো এবার তাহলে স্নান করে আসি।

বিশ্রামাগার থেকে পুত্রসহ বনহুর স্নানাগারের দিকে এগিয়ে চলে।

নূর বনহুরের হাত ধরে এগোয়। দু'চোখে তার বিস্ময়। অবাক হয়ে দেখতে থাকে সব। নূরী পূর্বেই সাবধান করে দেওয়ায় বনহুরের পাহারারত অনুচরগণ সবাই সরে পড়েছিলো। জনশূন্য দেখাচ্ছিলো জায়গাটা।

এবার বনহুর আর নূর স্নানাগারে প্রবেশ করে। সুন্দর ঝরণাধারা পাথরের গা বেয়ে নিচে নেমে এসেছে। নিল স্বচ্ছ জলের বুকে ফুটে আছে অসংখ্য রক্তপদ্ম, কোথাও বা শ্বেতপদ্মের ঝাঁক দোল খাচ্ছে দীঘির বুকে। চারপাশে পাথরের প্রাচীর ঘেরা, উপরে মুক্ত আকাশ, মাঝখানে দীঘি।

নূর আনন্দধ্বনি করে উঠে—ভারী সুন্দর!

এসো, তোমার জামা-কাপড় খুলে দেই।

তুমি খুলবে না আব্বা?

হাঁ, আমিও জামা খুলবো। বনহুর নূরের দেহ থেকে জামা খুলে রাখে। নিজেও খুলে ফেলে গা থেকে জামাটা। তারপর পিতা-পুত্র প্রাণ খুলে দীঘির পানিতে স্নান করে।

নূরকে কোলে করে বনহুর ঝরণার নিচে এসে দাঁড়ায়, উপর থেকে পাথরের গা বেয়ে ঝরে পড়ছে স্বচ্ছ জলধারা। নূর খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠে।

বনহুর আর নূর যখন স্নানাগারে স্নান করছিলো তখন নূরী আড়াল থেকে ওদের দেখে খুশিতে আত্মহারা হচ্ছিলো, বারবার ওর ইচ্ছা হচ্ছিলো ছুটে গিয়ে যোগ দেয় ওদের সঙ্গে। কিন্তু বনহুরের নিষেধ, নূরের সম্মুখে সে যেন না আসে।

বনহুর নূরীকে নূরের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাইলেও নূরের কাছে যে গোপন নেই, একথা জানে না ওরা কেউ।

স্নান করতে করতে হঠাৎ বলে নূর-আব্বা, ঐ সুন্দর মেয়েটি কে?

কই, কোথায় সুন্দর মেয়ে?

ঐ যে তুমি কথা বলছিলে তখন?

বনহুর যেন আড়ষ্ট হয়ে যায়, বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে— কই, কখন আমি কথা বলেছি?

ঐ যে তুমি আমাকে খাটে বসিয়ে ... ...

ওঃ এবার বুঝেছি। ও—ও আমার ছোট বোন।

তবে আমার সামনে আসে না কেন?

তুমি ওকে চেনো না তাই।

আমি ওকে দেখবো। খুব ভাল মেয়ে, তাই না?

হাঁ।

আমার কথা বলছিলো বুঝি?

হাঁ।

বনহুর যা আশংকা করেছিলো তাই হলো— নূরীকে গোপন রাখতে চেয়েছিলো ওর কাছে, কিন্তু পারলো না। বনহুর নূরের গোয়েন্দা মনোভাব লক্ষ্য করে মৃদু হাসলো।

বনহুর এবার স্নান সেরে উঠে পড়লো, নূরকে নিয়ে ফিরে এলো সে তার রত্নাগারে। নূরের সম্মুখে খুলে ধরলো বাক্সের ডালা— নাও, কোন্ হার তোমার পছন্দ?

নূরের দু'চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেছে। কক্ষের উজ্জ্বল আলোতে রত্নহারগুলো যেন আগুন ছড়াচ্ছে। শিশু হলেও নূর বিস্মিত হলো কম না। সে সুন্দর একটা হার হাতে তুলে নিলো।

এবার বনহুর আর নূর খাবার টেবিলে এসে বসলো। টেবিলে স্তূপাকার খাবার থরে থরে সাজানো। বনহুর নূরের সম্মুখে খাবারগুলো এগিয়ে দিয়ে বললো— খাও আব্বু, যা তোমার খেতে ইচ্ছে করে খাও।

বনহুর নিজেও খেতে শুরু করলো।

খাওয়া শেষ হলে বনহুর ফিরে এলো পুনরায় বিশ্রামাগারে। বললো বনহুর— একটু বিশ্রাম করে নাও আব্বু, তারপর তোমার মায়ের কাছে যাবে, কেমন?

হাঁ, তাই যাবো। নূর হার গলায় পরে শুয়ে পড়লো।

বনহুর পাশের টেবিল থেকে একটা ফুল নূরের হাতে দিলো।

নূর আনন্দভরা কণ্ঠে বললো—কি সুন্দর ফুল! তারপর নাকে ধরলো সে পুষ্পটা।

ধীরে ধীরে নূরের চোখের পাতা বন্ধ হয়ে এলো।

বনহুর শিস্ দিতেই কক্ষে প্রবেশ করলো নূরী, দু'চোখে তার খুশির উচ্ছ্বাস।

বনহুর বললো—ওকে এবার নিয়ে যাই?

নিয়ে যাবে হুর? দাঁড়াও আমি ওকে আবার নিজের হাতে সাজিয়ে দেই।

কিন্তু কানে বালা, হাতে বালা নয়—ওসব পরবে তোমার ছেলে জাভেদ,মনিকে তুমি সভ্য সমাজের ছেলের মত করে সাজিয়ে দাও।

আচ্ছা, তাই হবে। নূরী ইচ্ছামত নূরকে সাজিয়ে দিলো সুন্দর ভদ্র বেশে।

বনহুর হেসে বললো—আমাকে সাজিয়ে দেবে না নূরী?

নূরী মুখে কিছু না বলে এগিয়ে গেলো বনহুরের দিকে। আপন হাতে বনহুরের পোশাক পরায় সাহায্য করলো সে। জামার বোতাম লাগিয়ে দিলো, সুন্দর করে চুলগুলো আঁচড়ে দিয়ে বললো—নাও, এবার হলো তো? বনহুর নূরীর চিবুকে মৃদু চাপ দিয়ে আদর করে বললো—চলি এবার কেমন

চলি নয়—এসো। বললো নূরী।

বনহুর নূরকে তুলে নিলো কোলে।

এমন সময় কায়েস এসে দাঁড়ালো—সর্দার তাজ প্রস্তুত।

আচ্ছা চলো। নূরীকে লক্ষ্য করে বললো—খোদা হাফেজ।

নূরী অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো—খোদা হাফেজ!

নূরের হাতখানা ধরে আর একবার চুমু দিলো নূরী শেষ বারের মত।

❑

গাড়ির পিছন আসনে শুয়েছিলো নূর, চোখ রগড়ে উঠে বসে বলে—আব্বু, আমি বড্ড ঘুমিয়েছিলাম তাই না?

ড্রাইভ আসন থেকে জবাব দিলো বনহুর—হাঁ তুমি অনেক ঘুমিয়েছো।

আব্বু, আমাকে আর তোমার বাড়িতে নিয়ে যাবে না? কি সুন্দর বাড়িটা কি সুন্দর---

আবার যাবে? যাবে তুমি নূর?

যাবো।

আচ্ছা, আবার যেও---

একসময় পৌঁছে গেলো বনহুর নূরসহ চৌধুরী বাড়ির সদর গেটে।

সরকার সাহেব ছুটে এসে নিজে হাতে গাড়ির দরজা খুলে দিলেন, তারপর নূরকে কোলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, হাসতে লাগলেন বনহুরের দিকে তাকিয়ে।

মনিরার কক্ষে প্রবেশ করে বললো বনহুর—মনিরা, তোমার নূরকে ফিরে পেয়েছো তো?

হাসলো মনিরা—পেয়েছি।

বড্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলে বুঝি?

তা পেয়েছিলাম বৈকি! তোমার মত বাপকে বিশ্বাস কি, বলে মনিরা।

সে তো সত্যি কথা। ছেলে আমার অথচ আমাকে তুমি বিশ্বাস করোনা। যার ধন সেই চোর, কেমন----

এমন সময় নূর আর সরকার সাহেব কক্ষে প্রবেশ করে। নূর মাকে জড়িয়ে ধরে—আম্মি।

সরকার সাহেব হেসে বেরিয়ে যান।

মনিরা বলে—নূর, তোমার আব্বুর ওখানে কি কি দেখলে, কেমন লাগলো বললে না তো?

আম্মি, তোমাকে কি বলবো, তুমি চোখে না দেখলে আমার কথা বিশ্বাস করবেনা।

নূরের কথা শুনে হাসলো বনহুর।

মনিরা নূরসহ খাটে এসে বসলো—বলো তো আব্বু কি দেখলে সেখানে?

নূর সবকথা বললো যা সে দেখেছে। গলার হার দেখিয়ে বললো আম্মি, দেখো আব্বু আমাকে কত সুন্দর হার দিয়েছে। এর একটা হার আমি তোমায় দেবো।

বাঃ! চমৎকার হার। মনিরা নূরের গলার হার দুটো নেড়ে চেড়ে দেখতে থাকে।

নূর নিজ গলা থেকে হার খুলে পরিয়ে দেয় মায়ের গলায়।

বনহুর বলে উঠে—চমৎকার লাগছে।

ঠিক বলেছো আব্বু, আম্মিকে হার পরে সুন্দর লাগছে।

মনিরা চাপাস্বরে বলে—যাও, ছেলের সামনে লজ্জা করেনা তোমার?

হাসে বনহুর।

নূর এক ছুটে এবার দাদীমার কাছে চলে যায়। কাল থেকে দাদীমাকে দেখেনি সে।

বনহুর বলে—দেখলে, নূর আমাদের সুযোগ দিয়ে সরে গেলো। এসো-

ছিঃ! কেউ এসে পড়বে।

মনিরা, এবার হয়তো শীঘ্র আসতে পারবো না।

মনিরা আঁতকে উঠে বললো—কেন? কেন আসতে পারবে না?

অনেক কাজ আছে।

কাজ তোমার ফুরাবে না কোনোদিন।

মনিরা, কাজ আছে বলেই তো আমি বেঁচে আছি।

স্বামীর বুকে মাথা রাখে মনিরা, আর কিছু বলতে পারে না সে।

❑

দরবারকক্ষে সুউচ্চ আসনে বসে আছে স্বয়ং দস্যু বনহুর। সম্মুখে দণ্ডায়মান বন্দী মনসুর ডাকু এবং তার অনুচরগণ। মনসুর ডাকুর চোখ দিয়ে আগুন ঝরে পড়ছে। লৌহশিকলে তার হাত পা বাঁধা।

বনহুরের অনুচরগণ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে চারপাশে। প্রত্যেকের হাতে রাইফেল বর্শা আর বল্লম।

বনহুরের আসনের পাশে দণ্ডায়মান রয়েছে রহমান।

সবার দেহেই জমকালো পোশাক।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—মনসুর তুমি কি চাও আমার কাছে—মুক্তি না মৃত্যু?

মনসুর একটু নড়ে দাঁড়ালো, তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বললো—দুটোর একটাও আমি চাই না।

তবে কি চাও?

তোমার পিতার প্রতিশোধ আমি তোমার উপর নিতে চাই।

বনহুর অট্টহাসি হেসে উঠে—হাঃ হাঃ হাঃ-----তরপর হাসি থামিয়ে বলে—পিতার প্রতিশোধ নেবে?

হাঁ, আমি তোমাকে হত্যা করবো বনহুর। তোমার পিতা কালু খাঁ আমাকে শুধু কাবুই করেনি, সে আমাকে সর্বতোভাবে ধ্বংস করেছিলো।

তুমি কি আমাকে মেষ-শাবক পেয়েছো যে, পিতা বা পিতামহের দোহাই দিয়ে আমাকে ভক্ষণ করতে চাও? —রহমানের দিকে ফিরে তাকায় বনহুর—রহমান?

বলুন সর্দার!

মনসুরের হাতের বাঁধন মুক্ত করে দাও।

চমকে উঠে রহমান।

দরবারকক্ষে বনহুরের অন্যান্য অনুচর সবাই যেন চমকে উঠলো একসঙ্গে। মনসুর ডাকুর হাতের বাঁধন খুলে দিতে বলার মত বিস্ময়কর বুঝি আর কিছু নেই।

রহমান ইতস্ততঃ করছে বলে বললো বনহুর—বিলম্ব করছো কেন, খুলে দাও ওর হাত পার শিকল।

সর্দার----

জানি তুমি কি বলতে চাচ্ছো রহমান। কিন্তু তুমি তো জানো, দস্যু বনহুর কাউকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করে না।

রহমান মনসুরের হাত-পা থেকে লৌহশিকল খুলে দেয়।

বনহুর বলে—একটা ছোরা দাও ওর হাতে। ও নাকি আমাকে হত্যা করবে।

রহমান এবারও ইতস্ততঃ করছে দেখে বনহুর নিজেই নিজ কোমরের বেল্ট থেকে ছোরাখানা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলো মনসুর ডাকুর দিকে।

মনসুর ডাকু ছোরাখানা ধরে ফেললো, কিন্তু তার চোখেও বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

বনহুর বললো—এসো, আমাকে হত্যা করবে না?

বনহুর, আমার সঙ্গে তামাশা করছো?

না, তামাশা নয়—সত্যি।----একটু থেমে বললো বনহুর—একদিন তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছিলে, তোমার খেয়াল না থাকলেও আমার খেয়াল আছে। আমার বাপুর কাছে তুমি যখন পরাজিত হয়ে প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছিলে তখন তোমার এক অনুচর আমাকে সম্মুখে পেয়ে হত্যা করতে নিয়েছিলো, তুমি তাকে ক্ষান্ত করেছিলে। মনসুর, বহুদিন আগের কথা হলেও স্মরণ আছে আমার, কাজেই আমি তোমাকে হত্যা করতে পারলাম না। বরং তুমি যদি পারো আমাকে হত্যা করে আমার পিতার কাছে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারো।

মনসুর কি যেন ভাবলো, তারপর ছোরাখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এগিয়ে গেলো বনহুরের দিকে হাত দু'খানা দিয়ে চেপে ধরলো বনহুরের হাত দু'খানা বললো—বনহুর, তুমি আমাকে মাফ করে দাও।

রহমান বলে উঠলো—সর্দার, এর মৃত্যুদণ্ড হোক।

বনহুরের অন্যান্য অনুচর সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো—সর্দার মনসুর ডাকুকে ক্ষমা করা চলবে না।

বনহুর তাকালো তার অনুচরদের মুখের দিকে। তারপর ফিরে তাকালো মনসুর ডাকুর মুখে। বললো—ক্ষমা আমি করতে পারি তোমাকে এক শর্তে—তুমি কোনোদিন সৎ এবং মহৎ ব্যক্তির বাড়িতে হানা দিতে পারবে না বা তাদের সর্বস্ব লুটে নিতে পারবে না।

বেশ, আমি শপথ করলাম।

শুধু শপথ করলাম বললেই তোমাকে আমি বিশ্বাস করবো না। কোরান স্পর্শ করে তোমাকে শপথ করতে হবে।

হাঁ, রাজি আছি।

বনহুরের কার্যকলাপে তার অনুচরগণ সবাই বিমুখ হলো কিন্তু কোনো কথা বলতে কেউ সাহসী হলো না। বনহুরের ইংগিতে দরবারকক্ষে কোরান আনা হলো।

কোরান মজিদ স্পর্শ করে শপথ করলো মনসুর ডাকু—সৎ মহৎ ব্যক্তির উপর আমি কোনদিন জুলুম-অত্যাচার করবো না। দস্যু বনহুরের বিরুদ্ধে নিজেকে উত্তেজিত করবো না----

বনহুর মনসুর ডাকুসহ তার অনুচরগণকে মুক্ত করে দিলো।

পুরা দুঃমাস বন্দী ছিলো ওরা বনহুরের গোপন কারাগারে। বনহুর ওদের মুক্তি দিলেও তখনই ছেড়ে দিলো না, বললো—মনসুর তুমি আমার পিতৃস্থানিয় কাজেই আমার এখানে তোমার আজ দাওয়াত রইলো।

তখনকার মত দরবার ভঙ্গ হলো।

❑

উৎসব শুরু হলো। একটা সুউচ্চ আসনে বসেছে স্বয়ং দস্যু বনহুর। পাশের আসনে উপবিষ্ট মনসুর ডাকু।

নানারকম লাঠি খেলা, ছোরা খেলা এবং পুরুষদের নানা ভঙ্গীমায় নাচ চললো। বনহুরের দরবারে কোনোদিন নর্তকীর নাচ হয়না। নারী নিয়ে বনহুরের কারবার নেই, তবে অত্যন্ত নিজস্ব কোনো উৎসব হলে মাঝে সাঝে কখনও নাচতো নূরী বা নাসরিন।

উৎসব শেষে খানা খাবার পালা।

সবাইকে খেতে দেওয়া হলো।

বহুদিন মনসুর ডাকুর অনুচরগণ ভাল খাবার থেকে বঞ্চিত ছিলো, আজ ভাল সুন্দর খাবারগুলো গোগ্রাসে খেতে লাগলো। মনসুর ডাকু এবং দস্যু বনহুরও খেতে লাগলো।

খাওয়া শেষ হলে দেখা গেলো মনসুর ডাকু এবং তার দলবল সবাই সংজ্ঞা হারিয়ে যে যার আসনে লুটিয়ে পড়েছে।

বনহুরের ইংগিতেই সকলের খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। মনসুর ডাকু এবং তার দলবল যখন সবই জ্ঞান হারিয়ে নিজ নিজ আসনে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো তখন বনহুর তার অনুচরদের আদেশ দিলো—এদের সবাইকে অজ্ঞান অবস্থায় আস্তানার বাইরে পূর্বের সেই স্থানে রেখে এসো, যেখানে তাদের বন্দী করা হয়েছিলো। তাঁবু খাটিয়ে যত্ন সহকারে রেখে আসবে।

সর্দারের কথায় কেউ কোনো প্রতিবাদ করতে সাহসী হলো না। সবাই সর্দারের আদেশমত কাজ করলো।

মনসুর ডাকু এবং তার সংজ্ঞাহীন অনুচরদের সবাইকে বনহুরের কথামত ঠিক জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে সুন্দরভাবে শুইয়ে রাখা হলো।

একসময় জ্ঞান ফিরে এলো মনসুর ডাকু এবং তার অনুচরগণের। তারা উঠে বসলো—কিন্তু একি! এ কোথায় তারা? মনসুর বুঝতে পারলো, বনহুর তাদের মুক্তি দিলেও তার আস্তানার সন্ধান জানতে দেয়নি।

মনসুর ডাকু দলবল নিয়ে ফিরে গেলো তার দেশে।

❑

কোরান স্পর্শ করে শপথ করলেও মনসুর ডাকুর মন থেকে প্রতিহিংসার আগুন নিভলো না।

মনসুর ডাকুর আস্তানার একটা পর্বতের গুপ্ত গুহায় মনসুর ডাকু এবং তার দলবল বসে আলোচনা করছে। গভীর রাত, কাজেই গুহার মধ্যে দপ দপ করে মশাল জ্বলছে।

মনসুর ডাকু এবং তার অনুচরদের মুখে মশালের আলো পড়ে এক ভয়ঙ্কর রূপ দেখাচ্ছে। এক-এক জনের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

মনসুর ডাকু কঠিন কণ্ঠে বললো—সেদিনের ছোকরা হয়ে আমাকে নাকানি-চুবানি খাওয়ালো। আর আমি তাকে কিছু বলবো না? যতক্ষণ না বনহুরকে হত্যা করেছি ততক্ষণ আমার স্বস্তি নেই।

মনসুর ডাকুর অনুচরগণ সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো—সর্দার ঠিক বলেছেন। আপনার চেয়ে বড় ডাকু কেউ থাকবে, এটা--

কি বললে তোমরা? বনহুর আমার চেয়ে বড় ডাকু?

এবার একজন বলে উঠলো —সর্দার বনহুর আপনাকে যে নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছাড়লো সে মাফ করে দিয়ে মুক্তি না দিলে আপনাকে মরতে হতো, তার সঙ্গে আমরাও মরতাম। কাজেই প্রমাণিত হচ্ছে, সে-ই আপনার চেয়ে বড় ডাকু---

কি বললে? এতবড় সাহস তোমার! আমার মুখের সামনে বনহুরকে বড় ডাকু বলে প্রমাণ করতে চাও? ওকে এই মূহূর্তে হত্যা করো।

মনসুর ডাকুর মুখ থেকে কথাটা উচ্চারণ হবার সঙ্গে সঙ্গে একজন সেই লোকটার বুকে সমুখে ছোরা বিদ্ধ করে দিলো।

একটা বিকট আর্তনাদ করে লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো ভূতলে। রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো গুহার মেঝে।

মনসুর ডাকু বলে উঠে—নিয়ে যাও ওকে, ফেলে দিয়ে এসো পর্বতের গুপ্ত গুহার অন্ধ গহ্বরে।

কয়েকজন লোক লোকটার মৃতদেহটা নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

মনসুর ডাকু হুংকার ছেড়ে বললো—আমাদের মধ্যে যে দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করে আমার সম্মুখে হাজির করতে সক্ষম হবে তাকে আমি পাঁচ হাজার স্বর্ণমূদ্রা পুরস্কার দেবো।

এবার পিছন থেকে একজন অনুচর বলে উঠলো—সর্দার, আপনি পবিত্র কোরান স্পর্শ করে যে শপথ করলেন, কোনো অন্যায় আপনি করবেন না?

এটা অন্যায় নয়—প্রতিশোধ। হাঁ আজ রাতেই আমি হানা দেবো কান্দাই শহরের চৌধুরী বাড়িতে। বনহুরের সন্তান নূরকে চুরি করে আনতে

হবে----হোঃ হোঃ হোঃ তারপর দেখে নেবো দস্যু বনহুরের বাহাদুরি---হোঃ হোঃ হোঃ -----

মনসুর ডাকুর হাসি যেন থামতে চায় না।

মনসুর ডাকুর চোখ যেন জ্বলতে থাকে মশালের আলোতে।

❑

সরদার, মনসুর ডাকুকে ওভাবে মুক্তি দেওয়া ঠিক হলোনা। রহমান কথাটা বলে নত হয়ে দাঁড়ালো।

বনহুর বললো—জানি রহমান, কিন্তু দস্যু হলেও আমার প্রাণ আছে, আমিও মানুষ। যে একদিন আমার প্রাণ রক্ষা করেছিলো, আমি কি করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেই?

সর্দার মনসুর ডাকু বড় হারামি, সে কোরান স্পর্শ করে শপথ করলো বটে কিন্তু শপথ না -ও রক্ষা করতে পারে।

সে কথা আমার মনেও উদয় হয়েছিলো রহমান। তবু আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। দেখা যাক সে কি করে।

রহমান আর বনহুরের মধ্যে কথা হচ্ছিলো, এমন সময় কায়েস এসে কুর্ণিশ জানিয়ে দাঁড়ায়, চোখে মুখে তার ব্যস্ততার চিহ্ন। বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো—সর্দার একটা দুঃসংবাদ।

চমকে একসঙ্গে উচ্চারণ করলো বনহুর আর রহমান—দুঃসংবাদ!

হাঁ সরদার। গতরাতে কান্দাই শহরে চৌধুরী বাড়িতে কে বা কারা হানা দিয়ে বহু ধন-সম্পদ লুটে নিয়ে গেছে। তার সঙ্গে নূরকে--.

বনহুর যেন আর্তনাদ করে উঠলো—নূরকে কি--কি করেছে তারা বলো?

নূরকে হরণ করে নিয়ে গেছে।

নূরকে হরণ করে নিয়ে গেছে তারা?

হাঁ সরদার।

এ সংবাদ কে বহন করে এনেছে কায়েস?

আমাদের একজন অনুচর।

বনহুর ফিরে তাকালো রহমানের মুখের দিকে, বললো সে—রহমান এই মুহূর্তে তাজকে তৈরি করো, কান্দাই রওনা দেবো।

রহমান একটু চিন্তা করে বললো—সরদার, এই সময় কান্দাই যাওয়া কি ঠিক হবে? কারণ চৌধুরী বাড়িতে পুলিশ সর্বদা পাহারারত রয়েছে।

হাঁ সে কথা মিথ্যা নয় রহমান। কিন্তু বিলম্ব করাও যে আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সরদার আমি নিজে গিয়ে আগে আসল খবরটা যেনে আসি তারপর আপনি---

বেশ, তাই যাও। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, কার এতবড় সাহস চৌধুরী বাড়িতে হানা দেয়।

সর্দার, এ কাজ মনসুর ডাকু ছাড়া আর কারো নয়, সে-ই নূরকে হরণ করে আপনাকে শায়েস্তা করতে মনস্থ করেছে।

তোমার অনুমান সত্য হতে পারে রহমান। যাও, আগে জেনে এসো সব সংবাদ তারপর আমি দেখে নেবো মনসুর ডাকুকে। দাঁতে দাঁত পিষে পায়চারী শুরু করে বনহুর।

রহমান বেরিয়ে যায়।

ছদ্মবেশে রহমান পৌছে যায় চৌধুরী বাড়িতে।

রহমান দেখলো, সমস্ত চৌধুরী বাড়িতে একটা গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মরিয়ম বেগম দেওয়ালে মাথা ঠুকে রক্তপাত করে ফেলেছেন—নূর যে তার জানের চেয়েও বেশি। নূরের শূন্য বিছানায় লুটোপুটি করে কাঁদছেন তিনি।

মনিরা যেন পাথরের মানুষ বনে গেছে, সে এক একবার বলছে —হবেনা বাপের পাপ সন্তানকে গ্রাস করেছে। আমার নূর আর কোনোদিন ফিরে আসবে না।

সরকার সাহেব একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটো ছুটি করছেন। এখানে-সেখানে -খোঁজ খবর করে চলেছেন কখনও বা পুলিশ অফিসে কখনও আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে।

বাড়ির সবাই চিন্তায় মগ্ন, ফুলমিয়া কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। বার বার মনিরাকে এসে বলছে—বৌরাণী, বলুন সাহেবের ঠিকানা বলুন, আমি এক্ষুণি গিয়ে ডেকে আনছি।

মনিরা নির্বাক, ফুলমিয়ার কথা তার কানে যাচ্ছে কিনা বোঝা মুস্কিল। পাগলিনির মত শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে ফুল মিয়ার কথায় কোনো জবাব সে দিচ্ছে না।

চৌধুরী বাড়ির টাকা-পয়সা অলঙ্কারাদি সব নিয়ে গেছে তবু দুঃখ নেই কারো কিন্তু নূরের জন্য সকলের মনে গভীর শোক। নূরকে হারিয়ে পাগল হয়ে পড়েছে যেন সবাই।

রহমান এমন সময় এক গণকের ছদ্মবেশে হাজির হলো।

দরজায় দাঁড়িয়েছিলো ফুলমিয়া, গণককে দেখে সে খুশি হয়ে ছুটে গেলো উপরে—-বৌরাণী, বৌরাণী, একজন গণক এসেছেন—নূর কোথায় আছে হয়তো বলতে পারবে।

এতক্ষণে যেন হুঁশ হলো মনিরার সে তাড়াতাড়ি সে ফুল মিয়াকে লক্ষ্য করে বললো—যাও ভিতরে নিয়ে এসো, আমার নূরের সন্ধান বলতে পারে কিনা জানতে চাই।

ফুলমিয়া চলে গেলো, একটু পরে গণকবেশি রহমানসহ হলঘরে এসে দাঁড়ালো।

মনিরা আর মরিয়ম বেগম ততক্ষণে নিচে নেমে এসেছেন।

গণকঠাকুরবেশি রহমান সম্মানে কুর্ণিশ জানালো?

মনিরা রহমানকে দেখেই চিনতে পারলো, বললো—সর্বনাশ হয়ে গেছে রহমান সর্বনাশ হয়ে গেছে।

রহমান বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—সব সংবাদ পেয়েছি বৌরাণী।

এতক্ষণে মরিয়ম বেগম রহমানকে আন্দাজে চিনে নেন, তিনি বলে উঠলেন—তুমি এসেছো—সে কই, সে হতভাগা এলো না।

রহমান বললো—মা, সর্দার আসতে চেয়েছিলেন কিন্তু এখন আশা তার ঠিক হবে না। কারণ পুলিশ সর্বদা এ বাড়ির চারিদিকে কড়া পাহারারত আছে। আমি অনেক সাবধানে এসেছি---

মনিরা বললো —এখন কি করি রহমান, বলো?

বৌরাণী, আপনি ভাববেন না, নূরের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। তাকে যেই হরণ করে নিয়ে থাক, সাবধানে রাখবে। কারণ তারা জেনেশুনেই তাকে হরণ করেছে—কার ছেলে একথা তারা ভুলে যাবে না---

রহমান উচ্ছল হয়ে উঠে কথা বলতে বলতে।

মনিরা রহমানের কথায় সান্ত্বনা খুঁজে পায় না। হাজার হলেও মায়ের প্রাণতো।

মরিয়ম বেগম বললেন—যাই বলো, মনিরকে গিয়ে বলবে সব কথা। নূরকে না পেলে আমি জান ত্যাগ করবো---আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেন তিনি।

রহমান যতটুকু সম্ভব সান্ত্বনা দিয়ে একসময় বিদায় গ্রহণ করলো। গিয়েই সর্দারকে পাঠাবে বলে গেলো।

কিন্তু সদর গেট পার হবার সঙ্গে সঙ্গে একদল পুলিশ রহমানকে গ্রেপ্তার করে ফেললো। একেবারে আচমকা, রহমান বুঝতে পারলো না কিছু।

রহমানকে বিদায় জানিয়ে মনিরা ও মরিয়ম বেগম উপরে উঠে আসতেই ফুলমিয়া হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো, ব্যস্তকণ্ঠে বললো—বৌরাণী ওকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছি!

চমকে ফিরে তাকায় মনিরা আর মরিয়ম বেগম, একসঙ্গে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠেন তারা---কি বললে?

ফুলমিয়া খুশিভরা চাপা কণ্ঠে বলে—লোকটা আসলে গণকনয়, ভণ্ড লোক। ওর দাঁড়িগুলো হঠাৎ একবার খুলে গিয়েছিলো, আমি দেখে ফেলেছি। বেটা জানে না সে মনে করেছিলো আমি বুঝি বড্ড বোকা, কিছু দেখিনি।

তা কি করেছো—ভাল করে বলো ফুলমিয়া কি করেছো তুমি?

কি আর করবো, লোকটাকে হলঘরে আপনাদের কাছে পৌছে দিয়ে আমি সোজা পুলিশ কে খবর দিয়েছিলাম।

কি সর্বনাশ করেছো ফুলমিয়া।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠে ফুলমিয়া —কেন, বৌরাণী ভাল কাজ করিনি?

জান না ফুলমিয়া, সে আমাদের কে ছিলো।

বৌরাণী আপনি মানে আপনারা তাকে চিনতেন?

হাঁ, হাঁ তুমি সর্বনাশ করেছো ফুলমিয়া। বললেন মরিয়ম বেগম।

ফুলমিয়া উঠিপড়ি করে ছুট দিলো হায় হায় একি করেছি আমি, হায় হায়, একি করেছি---

মনিরা ডাকলো—ফুলমিয়া শোন, শোন---

ততক্ষণে ফুলমিয়া সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেছে নিচে।

মনিরা এবং মরিয়ম বেগম দ্রুত ছাদের রেলিংয়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েই সম্মুখে তাকাতেই নজরে পড়লো একটা পুলিশ ভ্যানের উপরে পুলিশ পরিবেষ্টিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে রহমান। চারিদিকে উদ্যত রাইফেলধারী পুলিশ।

ফুলমিয়া ছুটে গিয়ে গাড়ির পাশে পৌছবার পূর্বেই রহমান সহ পুলিশ ভ্যানখানা দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলো।

বিপদের উপর বিপদ, মনিরা বসে পড়লো রেলিংয়ের পাশে।

❑

রহমানের বিলম্ব দেখে বনহুর উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়লো। সে চঞ্চলভাবে পায়চারী করে চলেছে। একসময় প্রবেশ করলো তার ওয়্যারলেস ক্যাবিনে, কান্দাই শহরের আস্তানায় সংবাদ নিয়ে জানলো, রহমান সেখানেও যায়নি। তবে সে গেলো কোথায়?

বনহুর তার বিভিন্ন আস্তানায় ওয়্যারলেসে নূর চুরি যাওয়ার সংবাদটা পাঠিয়ে সবাইকে সজাগ করে দিলো এবং আদেশ দিলো তারা যেন বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে নূরের সন্ধান করে।

বনহুর যখন ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ঠিক সেই মুহূর্তে কান্দাই আস্তানা থেকে সংবাদ আসে—রহমান পুলিশ হস্তে বন্দী হয়েছে---তারপর ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারী করতে লাগলো।

সর্দারের ক্রুদ্ধভাব লক্ষ্য করে বনহুরের অনুচরগণ ভীত হয়ে উঠলো। সবাই অমঙ্গল আশঙ্কায় আশঙ্কিত হলো

কায়েস সংবাদটা জানালো নূরীর কাছে।

নূরীতো কেঁদে কেটে আকুল হয়ে উঠলো বনহুরের পাশে এসে বললো—এতক্ষণ তুমি নীরব আছো? হুর যাও আর এক মূহূর্ত বিলম্ব করোনা—নূর কোথায়, সন্ধান করে নিয়ে এসো।

বনহুরের সুন্দর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। একদিকে নূর হরণ নিয়ে সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—তদুপরি রহমান পুলিশ হস্তে বন্দী।

❑

নূরের হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কাঁধে করে বয়ে এনে রাখলো মনসুর ডাকুর সম্মুখে। অন্যান্য অনুচর নানারকম জিনিসপত্র এবং সোনা-দানার মূল্যবান অলঙ্কার এনে রাখলো তারপর সবাই দাঁড়ালো গোলাকার হয়ে। এক-এক জনের সেকি ভয়ঙ্কর চেহারা তেমনি ভয়ঙ্কর তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ।

নূর ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে চোখেমুখে কালিমা পড়ে গেছে। থরথর করে কাঁপছে সে হরিণ শিশুর মত। জামার এখানে সেখানে ধুলো বালি লেগে আছে, কোথাও বা দস্যুদের আঁচড়ে ছিঁড়েও গেছে। কেঁদে কেঁদে চোখের পানি যেন শুকিয়ে গেছে। শুকনো পানির চিহ্ন ফুটে আছে সুন্দর দুটি গণ্ডে। যন্ত্রণায় বারবার মুখটা বিকৃত করছে নূর।

মনসুর ডাকু গর্জন করে উঠলো-এসব কোথাকার মাল রঘুলাল?

রঘুলাল মনসুর ডাকুর একজন বিশ্বস্ত অনুচর। সর্দারের কথায় বললো রঘুলাল—হুজুর এ সব চৌধুরী বাড়ি থেকে আমরা লুট করে এনেছি।

ওঃ এটাই তাহলে সেই নূর রত্ন?

হাঁ হুজুর।

বাঃ, চমৎকার! ঠিক নূরের আলোর মতই ফুটফুটে—বাপ কা বেটা---কথাটা বলে দাঁতে দাঁত পিষে বললো আবার সে—বাপের বদলা নেবো এর উপর। শুধু বাপের নয় ওর দাদুর প্রতিশোধ---হোঃ হোঃ হোঃ—হোঃ হোঃ হোঃ---যাও রঘুলাল ওকে বাঘের খাঁচার পাশের খাঁচায় বন্দী করে

রাখোগে। বাঘের থাবা যেন ওর দেহ স্পর্শ করতে না পারে অথচ ওকে দেখে বাঘের জিহ্বায় যেন লালা গড়িয়ে পড়ে বুঝলে?

বুঝেছি হুজুর। মালগুলো কোথায় রাখবো?

মালগুদামে। হঠাৎ মনসুর ডাকুর চোখদুটো জ্বলে উঠলো জ্বল জ্বল করে—দেখি দেখি, ঐ হীরক হারখানা আমার হাতে দাও।

রঘুলাল অন্যান্য অলঙ্কারের মধ্য থেকে মূল্যবান একটি হীরক হার তুলে নিলো বেছে, তারপর মনসুর ডাকুর হাতে দিলো।

নূর কেঁদে উঠলো এবার—ও হার তোমরা নিও না, ওটা আব্বু আমাকে দিয়েছে ও হার নিও না---

মনসুর ডাকু হেসে উঠলো অট্টহাসি—এ হার তোমার আব্বু তোমাকে দিয়েছিলো?

হাঁ হাঁ ও হার আমাকে দাও।

হার নেবে?

এসো---এসো নিয়ে যাও।

নূর ভুলে গেলো তার হাত-পা দড়ি দিয়ে বাধা আছে। যেমন সে ছুটে এগুতে গেলো অমনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো পাথরের মেঝেতে।

হেসে উঠলো মনসুর ডাকু।

নূর কেঁদে উঠলো অসহ্য যন্ত্রণায়।

মনসুর ডাকু নিজ হাতের হীরক হারটার দিকে লোলুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে তার চোখ দুটি। এমন অমূল্য হীরকহার সে পূর্বে দেখেছে কিনা সন্দেহ।

নূর পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলো সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে করুণ সুরে বললো—পানি খাবো, পানি খাবো--

মনসুর বললো—রঘুলাল, ওকে পানি দিতে বলো, কিন্তু--ইংগিতে কিছু যেন বললো।

অল্পক্ষণে পানি এলো, একজন নূরের দিকে এগিয়ে ধরলো পানির পাত্রটার দিকে।

নূর বিপূল পিপাসা নিয়ে মুখখানা বাড়িয়ে দিলো পানির পাত্রটার দিকে।

পানির পাত্র যেমন নূরের মুখের কাছে ধরেছে ঠিক সেই মুহূর্তে রঘুলাল মনসুর ডাকুর ইশারায় পদাঘাতে পানির পাত্র ফেলে দিলো দূরে।

পিপাসায় কাতর নূর আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলো।

হেসে উঠলো মনসুর ডাকু। তারপর বললো—নিয়ে যাও বাঘের খাঁচার পাশে--

রঘুলাল নূরের হাত এবং পায়ের বাঁধন কেটে দিয়ে টেনে নিয়ে চললো।

মনসুর ডাকু হারছড়া গলায় পরে নিয়ে বললো—বনহুর, তোমার ছেলেকে হরণ করে এনেছি এবার তোমার পালা। একসঙ্গে বাপ-বেটা দুজনকে পুড়িয়ে মারবো। কথাগুলো বলে আসন ত্যাগ করলো মনসুর ডাকু।

এবার মনসুর তার অনুচরদের প্রস্তুত হবার জন্য নির্দেশ দিলো। দস্যুতার জন্য তারা এবার বাইরে বের হবে। মনসুর সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে সেদিনের সেই শপথের কথা। মনসুর এখন আরও বেশি শয়তান হয়ে উঠেছে, তার কাছে মহৎ বা সৎ ব্যক্তি বলে কিছু নেই।

যার বাড়িতে সে হানা দেয় তার বাড়ি একেবারে নিঃশেষ করে নিয়ে যায়। খুন জখম তো আছেই।

মনসুর ডাকুর অত্যাচার একেবারে চরম আকার ধারণ করেছে। ব্যাঘ্র যেমন খাঁচা থেকে ছাড়া পেলে ভীষণ হয়ে উঠে, প্রকাশ্য দিবালোকে আক্রমণ করে মানুষ গরু বাছুরকে তেমনি মনসুর ডাকু বনহুরের বন্দীশালা থেকে মুক্তি পেয়ে যখন তখন যেখানে সেখানে দস্যুতা করে চললো।

বনহুর নীরব আছে মনে করে মনসুর ডাকু আরও বেশি দুর্দান্ত হয়ে উঠেছে। সে জানে, নূর বনহুরের কত আদরের ধন, কাজেই তাকে কাবু করার একমাত্র ওষুধই সে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে।

❑

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থান থেকে দস্যুতার সংবাদ এসে পৌঁছছে বনহুরের কানে। বনহুর যে এখন নিশ্চুপ আছে সেটা সত্য। চৌধুরী বাড়ি সে গিয়েছিলো একদিন মা এবং মনিরার কান্নায় সে বেশিক্ষণ সেখানে থাকতে

পারেনি, এমন কি সান্ত্বনাও দেবার মত কোন ভাষাও খুঁজে পায়নি পালিয়ে এসেছে সে নিজকে সংযত করতে না পেরে।

পুলিশ হস্তে বন্দী রহমান কাজেই বনহুরকে ভরসা দেবার মত পুরুষ কেউ নেই তার অনুচরদের মধ্যে। নূরীও অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েছে নূরের অপহরণ সংবাদ পেয়ে।

দস্যু বনহুরের আস্তানায় একটা শোকের ছায়া নেমে এসেছে যেন।

রহমানকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ মহল থেকে মোটা টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে কয়েকজন পুলিশ অফিসারকে। দস্যু বনহুরের অনুচর যে রহমান—একথা পুলিশ মহল ভালভাবে টের পেয়ে গিয়েছিলো, কারণ চৌধুরী বাড়ি থেকে বের হবার সময় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ রহমানকে হাঙ্গেরী কারাগারে বন্দী করে রেখেছে। পুলিশ মহল জানে দস্যু বনহুরের মৃত্যু ঘটেছে কিন্তু তার অনুচরগণ আছে এবং তারাই এখন শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে হানা দিয়ে লুটতরাজ করে চলছে।

তাই রহমানকে গ্রেপ্তার করার পর সর্তক পাহারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় হাঙ্গেরী কারাগারে তাকে রাখা হয়েছে, যেন সে কোনোক্রমে পালাতে সক্ষম না হয়।

সুউচ্চ প্রাচীর ঘেরা হাঙ্গেরী কারাগারের একটি কক্ষে বন্দী রহমান হিংস্র ব্যাঘ্রের মত ফুলছিলো। বিশেষ করে সর্দারের এ অবস্থায় তার পাশে থাকা একান্ত প্রয়োজন ছিলো। নূর হরণের পর পরই রহমান বন্দী হয়েছে—সে জানে না এখন কতদূর কি হলো।

আজ রহমানকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হবে, তার বিচার হবে সেখানে। আদালত-প্রাঙ্গণে অগণিত লোক ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে দস্যু বনহুরের অনুচর-বন্দীটিকে তারা দেখতে চায়।

উন্মুখ জনতার চাপে পথ একেবারে রুদ্ধ।

এগিয়ে আসছে পুলিশ ভ্যান—মাঝখানে বন্দী অবস্থায় দণ্ডায়মান রয়েছে রহমান।

জনতা বিস্ময় নিয়ে দেখছে দস্যু বনহুরের অনুচরটিকে।

আদালত প্রাঙ্গণে রহমানসহ পুলিশ ভ্যানে থানায় প্রবেশ করতেই হট্টগোল শুরু হলো, সবাই ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দিলো বন্দীকে দেখবার জন্য।

পুলিশ রাইফেল ফাঁকা আওয়াজ করতে শুরু করলো। লাঠি চার্জ চললো রীতিমত। অল্পক্ষণেই জনতা কমে এলো, আদালত প্রাঙ্গণ সম্পূর্ণ ফাঁকা প্রায়।

ভ্যান থেকে রহমানকে এবার নামানো হবে।

পুলিশরা সবাই নেমে দাঁড়িয়েছে। রহমান এবং ড্রাইভার এখনও ভ্যানের উপর আছে, হঠাৎ গাড়িখানা আদালত প্রাঙ্গণের পথ ধরে গেটের দিকে উল্কা বেগে ছুটতে শুরু করলো একেবারে আচমকভাবে।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ইন্সপেক্টর হাসান তীব্র চিৎকার করে উঠলেন—গাড়ির চাকা লক্ষ্য করে গুলী ছোড়, গুলী ছোড়---

এক সঙ্গে ফায়ার হলো কিন্তু ততক্ষণে বন্দী রহমানসহ পুলিশ ভ্যানখানা আদালত প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে রাজপথ ধরে স্পীডে ছুটতে শুরু করেছে।

পুলিশরা অন্য একটি গাড়ি নিয়ে ঐ গাড়ির পিছু ধাওয়া করলো বটে কিন্তু তার পূর্বেই রহমানসহ ভ্যানখানা অন্যান্য যানবাহনের ভিড়ে হারিয়ে গেছে।

পুলিশ ভ্যানখানা অনেক সন্ধান করেও আর বন্দীসহ গাড়িটার খোঁজ পেলো না ফিরে এলো সবাই আদালত প্রাঙ্গণে।

পুলিশ মহলে বিস্ময় জাগলো কে ছিলো সেইপুলিশ ভ্যানের ড্রাইভার? নিশ্চয়ই সে তাদের পুলিশ ড্রাইভার নয়—দস্যু বনহুরেরই আর একজন অনুচর হবে। মূহূর্তে শহরময় জানাজানি হয়ে গেলো ব্যাপারটা। এরকম অপদস্থ হয়েছে পুলিশ মহল লজ্জায় তাদের মাথা যেন নত হয়ে গেছে একেবারে। প্রকাশ্য দিবালোকে আদালত প্রাঙ্গন থেকে বন্দীসহ পুলিশ ভ্যানের উধাও কম কথা নয়।

সঙ্গে সঙ্গে কান্দাই শহরের বিভিন্ন পুলিশ ফাঁড়িতে সংবাদ জানিয়ে দেওয়া হলো। একটি পুলিশ ভ্যান পালিয়ে গেছে বন্দীসহ যেখানে পাওয়া যাবে যেন গ্রেপ্তার করা হয়।

শহরে যখন মহা হৈ চৈ পড়ে গেছে তখন রহমানসহ পুলিশ ভ্যানখানা গহন জঙ্গলের ভিতরের পথ ধরে ছুটেছে।

রহমানের মনে বিস্ময় আনন্দ আর উন্মাদনা। ড্রাইভারের আসনে যে বসে আছে সে তার সর্দার ছাড়া কেউ নয়—এ কথা বেশ উপলব্ধি করতে পারছে রহমান্।

জঙ্গলের মধ্যে একটা নির্জন জায়গায় গাড়িখানা থেমে পড়লো। ড্রাইভার আসন থেকে নেমে এলো পুলিশের ড্রেসে সজ্জিত দস্যু বনহুর।

রহমান পুলিশ ভ্যান থেকে নেমে পড়লো—যদিও তার হাত-পা লৌহশিকলে আবদ্ধ ছিলো তবু সে কুর্নিশ জানালো, তারপর অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো—সর্দার।

রহমান, আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করা যায় না, এই অবস্থায় তোমাকে আস্তানায় যেতে হবে, নাহলে তোমার হাত-পার শিকল খোলার কোনো উপায় নেই। বনহুর শিস্ দিলো সঙ্গে সঙ্গে তাজ আর দুলকী এসে দাঁড়ালো তার সম্মুখে।

বনহুর বললো —রহমান তুমি দুলকী নিয়ে চলে যাও।

আপনি?

আমি গাড়িখানার সদগতি করে আসছি। কারণ গাড়িখানা হঠাৎ কারো নজরে পড়লে পথের সন্ধান জানতে পারে।

রহমান অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসার চেষ্টা করলো কিন্তু পায়ে বেড়ি থাকায় চাপতে পারছে না।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো, এগিয়ে গেলো ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো মাটিতে তারপর বলিষ্ঠ হাত দু'খানা দিয়ে ভীষণ জোরে টান দিতে লাগলো। বিস্ময়ে দু'চোখ বিস্ফারিত হলো রহমানের তার পায়ের বেড়ির মুখ ধীরে ধীরে ফাঁক হয়ে গেলো।

অল্পক্ষণেই রহমানের পা'দুখানা মুক্তিলাভ করলো। রহমান চেপে বসলো দুলকীর পিঠে।

রহমান আস্তানার পথে অদৃশ্য হতেই বনহুর তাজের পিঠে হাত বুলিয়ে বললো—আর একটু অপেক্ষা তোকে করতে হবে তাজ। যা ততক্ষণে কিছু ঘাস ভক্ষণ করেনে।

তাজ প্রভুর কথা যেন বুঝতে পারলো সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

বনহুর এসে বসলো গাড়ির ড্রাইভিং আসনে। এবার গাড়ি নিয়ে সে পাহাড়ের পথে অগ্রসর হলো পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেলো উপরে। নিচে গভীর খাদ। বনহুর গাড়িখানা কৌশলে চালিয়ে উপরে তুলে নিলো তারপর গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে নিজে লাফিয়ে পড়লো গাড়ি খানা সোজা গিয়ে পড়লো গভীর খাদের মধ্যে হাজার ফুট নিচে।

গাড়িখানার অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো! বনহুর ফিরে এলো।

তাজ প্রভুর জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিলো। এবার প্রভুকে পেয়ে সে খুশিতে সম্মুখের পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে লাগলো। তাজের মনোভাব—এতক্ষণ প্রভু বিলম্ব করছে কেন, তার সঙ্গী দুলকী তাকে ছেড়ে চলে গেছে কখন! হয়তো এতক্ষণ সে পৌঁছে গেছে তাদের আস্তানায়।

বনহুর চেপে বসলো তাজের পিঠে।

কান্দাই শহরের বাইরে ফারহা বলে একটা বড় নগর আছে। এ নগরের সবচেয়ে ধনবান ব্যক্তি হলেন হাফিজুল রিজভী। দান করা হাফিজুল রিজভীর নেশা। অতিথি সেবা না করলে তিনি শান্তি পান না।

একদিন রাতে মনসুর ডাকু এবং তার কয়েকজন অনুচর এই মহান ব্যক্তির বাড়িতে অতিথি হয়ে উপস্থিত হলো।

সরল বিশ্বাসী হাফিজুল রিজভী বিনাদ্বিধায় আশ্রয় দিলেন এই দুরাচার শয়তান মনসুর ডাকু এবং তার কয়েকজন অনুচরকে। নানাভাবে তাদের আদর-অভ্যর্থনা জানালেন তিনি নিজে।

খাওয়া-দাওয়ার পর অন্তপুরের একটি বড় কামরায় তাদের শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন। কোনোরকম যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য বারবার তিনি সন্ধান নিয়ে দেখলেন।

গভীর রাত।

এশার নামাজের পর ঘুমিয়ে পড়েছেন হাফিজুল রিজভী। বাড়ির অন্যান্য সবাই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে। এমন কি পাহারাদারটি পর্যন্ত ফটকের রেলিংয়ের গায়ে ঠেশ দিয়ে ঘুমাচ্ছে।

মনসুর ডাকু এই সুযোগ গ্রহণ করলো—সে তার অনুচরসহ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আচমকা আক্রমণ করে বসলো বৃদ্ধ হাফিজুর রিজভীকে।

সমগ্র বাড়িখানার উপরে চালালো অকথ্য নির্মম আচরণ। কাউকে হত্যা করলো, কাউকে আহত করে লুটে নিতে লাগলো মূল্যবান জিনিসপত্র।

মনসুর ডাকু এসে দাঁড়ালো হাফিজুর রিজভীর সম্মুখে সূতীক্ষ্ণ ছোরাখানা তাঁর বুকে চেপে ধরে বললো—কোথায় আছে তোমার ধন-সম্পদের চাবিকাটি দাও?

নিদ্রাজড়িত চোখে সব স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে হাফিজুর রিজভীর। তিনি মনসুর ডাকুকে দেখেই চিনতে পারলেন। একেই তিনি সন্ধ্যা রাতে তাঁর বাড়িতে অতিথি হিসাবে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এক্ষণে হাফিজুর রিজভী তাঁর সম্মুখে সেই সম্মানিত অতিথিকে ছোরা হস্তে দণ্ডায়মান দেখে বিস্মিত না হয়ে হেসে বললেন—এই কি অতিথির কৃতজ্ঞতা স্বীকার?

হাঁ, আমায় চেনোনা রিজভী আমি কে?

রিজভীর জীবন প্রায় এখন শেষ হয়ে এসেছে। চিরদিন পরোপকার করেই তাঁর কেটেছে, মৃত্যুকে তিনি বড় একটা ভয় করেন না। তাঁর যেন বিষয়-আশয় এসবই তো পরের জন্য—নামাজ রোজা করেন আর পরের মঙ্গল কামনা করেন। কাজেই তিনি ভীত হলেন না এতটুকু বললেন—তুমি একজন ডাকাত?

হোঃ হোঃ হোঃ চিনতে পেরেছো তবে কিন্তু নামটা এখনও জানোনি? আমার নাম দস্যু বনহুর বুঝলে?

অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন হাফিজুর রিজভী—দস্যু বনহুর তুমি! পা থেকে মাথা অবধি অবহেলার চোখে তাকালেন তিনি তারপর বললেন—দস্যু বনহুর তোমার মত হীন জঘন্যমনা মানুষ নয়। তুমি শয়তান।

তুমি বিশ্বাস করো বা না করো—আমি দস্যু বনহুর।

দস্যু বনহুর কোনোদিন নিজের পরিচয় অমনভাবে দেয় না, তার পরিচয় তার কাজে। তাছাড়া দস্যুবনহুর তোমার মত লোভী নয়। কি করতে চাও করো।

তোমাকে হত্যা করবার পূর্বে তোমার মূল্যবান অলঙ্কারাদি এবং অর্থ আমি গ্রহণ করতে চাই।

বেশ, তাই করো। কিন্তু আমাকে হত্যা করবার পূর্বে তুমি কিছুই পাবে না কারণ আমার ধন-সম্পদ সবই গরিব দুঃখীর জন্য মজুদ রেখেছি।

বটে---মরতে তোমার এতটুকু ভয় নেই? জানো, তোমার বাড়ির যথাসর্বস্ব এখন আমার হাতের মুঠায়? শুধু বাকি তোমার আসল ধন ভান্ডারের সন্ধান---

কিন্তু সে সন্ধান আর তোমার ভাগ্যে হবে না মনসুর ডাকু---জমকালো পোশাক পরা কে যেন হিমশিতল একটা অস্ত্র চেপে ধরলো তার পিঠে।

চমকে ফিরে তাকলো মনসুর ডাকু—কে? কে দস্যু বনহুর তুমি?

হাঁ, চিনতে তোমার এতটুকু ভুল হয়নি দেখছি। মনসুর, তুমি আমার পিতার বয়সী তাই তোমাকে পদাঘাত করলাম না। কোরান স্পর্শ করে যে শপথ করেছিলে, এই কি তোমার শপথ রক্ষা? জবাব দাও?

হেসে উঠলো মনসুর ডাকু—হোঃ হোঃ হোঃ শপথ! ডাকুর আবার শপথজ্ঞান আছে নাকি?

তবেযে সেদিন বলেছিলে আর কোনোদিন তুমি অন্যায়ভাবে কারো উপর হামলা চালাবে না?

বলেছিলাম মানলাম না।

জানো, আজ আবার তোমাকে হাতের মুঠায় পেয়েছি। সেদিনের শপথ রক্ষা না করার প্রায়শ্চিত্ত আজ গ্রহণ করতে হবে।

বনহুরের রিভলভারের মুখ তখনও স্পর্শ করে আছে মনসুর ডাকুর পাঁজরে।

মনসুর ডাকুর মুখে তবু এতটুকু ভীতির চিহ্ন নেই। সে বললো —হত্যা করবে আমাকে? কিন্তু পারবে না, কারণ তোমার অমূল্য রত্ন নূর আমার হাতের মুঠায়।

বনহুর হুঙ্কার ছাড়লো—শয়তান যা ভেবেছিলাম তাই! তবে নূরকে তুমিই হরণ করে নিয়ে গেছো?

শুধু হরণ করে নিয়ে যাইনি, তাকে পাতালপুরীর এক অন্ধ গহ্বরে বাঘের খাঁচার পাশে আটক করে রেখেছি।

কি বললি?

যা বললাম সত্য। করো, আমাকে হত্যা করো বনহুর। আমাকে হত্যা করলে তোমার নয়নমণি চিরদিনের জন্য বিলীন হয়ে যাবে পাতালপুরীর অন্ধকারময় গহ্বরে।

যদিও বনহুরের মুখমণ্ডলের নিচের অংশ জমকালো পাগড়ির আঁচলে ঢাকা ছিলো তবু তার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো আগুনের ভাটার মত। দক্ষিণ হস্তে রিভলভার বাম হস্তে চেপে ধরলো মনসুর ডাকুর গলা। ইতিপূর্বেই বনহুর মনসুর ডাকুর হাতের ছোরাখানা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিয়েছিলো দূরে। ওর গলা ধরে ভীষণ জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বললো—একটা অবুঝ শিশুকে এভাবে আটক রাখতে তোমার এতটুকু মায়া হলো না শয়তান?

মনসুর ডাকু বললো—ডাকুর আবার মায়া! তোমার সন্তানকে এখনও জীবিত রেখেছি এটাই তোমার ভাগ্য। সিংহের সন্তান সিংহই হয়,তাই---

তাই তাকে নিঃশেষ করতে চাও এবং বাঘের খাঁচার পাশে বন্দী করে রেখেছো? শয়তান কোথায় তাকে বন্দী করে রেখেছো—চলো, সেখানে আমাকে নিয়ে চলো।

না, তুমি আমাকে হত্যা করো তবু তোমাকে সেই পাতাল গহ্বরে নিয়ে যাবো না, নিয়ে যেতে পারি না।

তবে বলো কোথায় সেই পাতাল গহ্বর?

হত্যা করো বুক পেতে দিয়েছি কিন্তু তোমার নূরকে পাবে না এবং পাতাল গহ্বরের সন্ধানও পাবে না।

তোমাকে আমি হত্যাই করবো মনসুর তারপর তোমার সেই পাতালপুরীর অন্ধগহ্বর খুঁজে বের করবো।

অট্টহাসি হেসে উঠে মনসুর ডাকু—হোঃ হোঃ হোঃ আমার সেই পাতালপুরীর অন্ধ গহ্বর খুঁজে বের করবে? ঐ বিশাল আকাশের নিচে বিরাট পৃথিবীর তলায় কোথায় পাবে খুঁজে----

তবে কি চাও আমার কাছে?

তুমি যদি অন্ধ গহ্বরে বন্দী হও তবে আমি তাকে মুক্তি দিতে পারি। তোমার পিতার পাপের প্রতিশোধ তাহলে নেওয়া হবে।

এতক্ষণ বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে দস্যু বনহুর আর মনসুর ডাকুর কথাগুলো শুনছিলেন হাফিজুল রিজভী। ইচ্ছা করলে টেলিফোনে এতক্ষণ পুলিশ ডেকে বাড়ি ঘেরাও করে ফেলতে পারতেন কিন্তু হাফিজুল রিজভী তা করলেন না। কারণ মনসুর ডাকুকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে দস্যু বনহুর বিপদগ্রস্ত হতে

পারে। তিনি দস্যু বনহুরকে কোনদিন চোখে দেখেননি, আজ তাকে প্রাণভরে দেখে নিচ্ছিলেন। এই মুহূর্তে যদি বনহুর আচমকা এসে না পড়তো তাহলে মৃত্যু তাঁর নিশ্চয়ই হতো তার সঙ্গে হারাতেন যথাসর্বস্ব তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হাফিজুল রিজভী সব শুনলেন বুঝলেন। দস্যু বনহুর দস্যু হলেও সে কত মহৎ তা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলেন। কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো তাঁর হৃদয়।

বনহুর বললো—মনসুর জীবনে যদি বাঁচতে চাও তবে নূরকে মুক্তি দাও। আজ তোমাকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিচ্ছি—যাও কিন্তু নূরকে সম্মানে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিও নচেৎ রিভলভার দেখালো—এটা থেকে পরিত্রাণ পাবে না।

মনসুর ডাকুও বললো—যতক্ষণ তুমি আমায় অন্ধ গহ্বরে আত্ম সমর্পণ না করেছো ততক্ষণ নূর তার মায়ের কাছে যেতে পারবেনা, কাজেই আমিও যা চাই ভেবে দেখো।

যাও, ভেবে দেখি। হাঁ মনে রেখো মনসুর আমার নূরের কোনো ক্ষতি হলে তোমাকে অগ্নিদগ্ধ করে মারবো।

মনসুর ডাকু চলে যাচ্ছিলো বনহুর বললো—তোমার অনুচরদের না নিয়েই যে বড় চলে যাচ্ছো? কেমন সর্দার তুমি? নিজের জীবন নিয়ে পালাতে পারলেই বাঁচো।

মনসুর ডাকু দাঁড়ালো।

বনহুর বললো—ঐ দিকের ঘরে তোমার অনুচরগণ বিশ্রাম করছে, ওদের নিয়ে যাও। হাঁ যাবার আগে হাফিজুল রিজভীর মালগুলো আবার যথাস্থানে গুছিয়ে রেখে যাও। নইলে তোমার অনুচরদের মুক্তি নেই।

মনসুর ডাকুর অনুচরগণ বাধ্য হলো যে মাল তারা লুট করে নিয়েছিলো আবার তা ফিরিয়ে দিতে।

মনসুর ডাকু তার দলবল নিয়ে সরে পড়লো।

হাফিজুর রিজভী বনহুরকে লক্ষ্য করে বললেন—এতদিন তোমার নাম শুনে এসেছি বন্ধু আজ তোমাকে দেখলাম। তোমার মহৎ হৃদয়ের আসল রূপ অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলাম। বন্ধু, আমার আর একটি মনোবাঞ্ছা তুমি পূর্ণ করো।

বনহুর বললো—বলুন?

আমি—আমি তোমার মুখ দেখতে চাই। একটি বার—শুধু একটিবার তোমার মুখের আবরণ উন্মোচন করো।

বনহুর বিনা দ্বিধায় নিজের মুখের কালো আবরণ সরিয়ে নিলো।

বৃদ্ধ হাফিজুল রিজভী নিস্পলক নয়নে নির্বাকভাবে তাকিয়ে রইলেন ওকে দেখে যেন প্রাণ ভরছে না—আরও আরও দেখতে চান তিনি।

বনহুর বললো—এবার চলি?

না, আরও একটু দেখি তোমাকে। প্রাণ ভরে দেখি---সত্যি তুমি মানুষ না ফেরেস্তা?

আমি মানুষ আপনাদেরই মত একজন। আচ্ছ চলি? কথাটা বলে হঠাৎ যেমন এসেছিলো বনহুর তেমনি বেরিয়ে গেলো।

হাফিজুল রিজভী নির্বাকচোখে তাকিয়ে রইলেন বনহুরের চলে যাওয়া পথের দিকে। মন-প্রাণ দিয়ে তিনি আশির্বাদ করতে লাগলেন হে রহমানুর রহিম যে পরের মঙ্গল চিন্তা করে তার জন্য তুমি চিন্তা করো প্রভু।

❑

মনিরা নূর জীবিত আছে, কিন্তু সে বড় কষ্টে বড় যাতনায় আছে! ---বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে বনহুরের কণ্ঠস্বর।

মনিরা আঁচলে অশ্রু মুছে সোজা হয়ে বসে—সে জীবিত আছে এ কথা তুমি কেমন করে জানলে?

যার কাছে আছে সেই বলেছে।

কার কাছে আছে —বলো কার কাছে আছে সে?

মনসুর ডাকু---

মনসুর ডাকু!

হাঁ মনিরা সেই নরাধম আমাকে হত্যা করতে চেষ্টা নিয়ে ব্যর্থ হয়েছে, তাই আমার সন্তানকে চুরি করে বন্দী করে রেখেছে। আমার প্রতিশোধ সে আমার সন্তানের প্রতি গ্রহণ করতে চায়।

এসব তুমি কি বলছো? এত লোককে তুমি শায়েস্তা করতে পারো আর মনসুর ডাকুকে তুমি---

জানি, তুমি যা বলতে চাচ্ছো সব জানি মনিরা কিন্তু আমি তা পারছি কই? মনসুর ডাকুকে আমি হাতের মুঠায় পেয়েছিলাম তবু--

কেন, কেন তুমি তাকে হত্যা করলে না? তুমি না বিনা দ্বিধায় শত শত ব্যক্তিকে যমালয়ে পাঠাতে পারো। আর একটা নর শয়তানকে হত্যা করতে তোমার এত বাধলো?

মনিরা শয়তান মনসুর ডাকুকে হত্যা করা আমার কিছুমাত্র কঠিন ছিলো না।

তবে কেন তাকে হত্যা করলে না?

ওকে হত্যা করলে আর কোনোদিন নূরকে পেতে না মনিরা, কারণ নূরকে সে এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে যা সে ছাড়া আর কেউ জানে না।

তাহলে কি নূরকে কোনোদিন পাবো না?

পাবে, কিন্তু তার পরিবর্তে আমাকে তারা হত্যা করবে, তারপর ফিরিয়ে দেবে তোমার নূরকে।

এ তুমি কি বলছো?

হাঁ মনিরা এবং সে কারণেই তো আমি এসেছি তোমার কাছে নূরকে উদ্ধার করতে হলে আমার জীবন---

না না, তা হতে পারে না। নূরের বিনিময়ে আমি তোমাকে হারাতে পারবো না। মনিরা বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে।

বনহুর ওকে গভীর আবেগে বুকে চেপে ধরে তার চোখ দুটোও অশ্রু ছলছল হয়ে এসেছে। বললো বনহুর—মনিরা নূরকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই। কেঁদোনা নূরকে তুমি পাবেই।

কিন্তু তোমার অমঙ্গল যদি হয়? আমি কিছুতেই তা সহ্য করতে পারবো না।

মনিরার শত বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করে বনহুর বেরিয়ে পড়লো গভীর রাত্রির অন্ধকারে নূরের সন্ধানে।

নানা ছদ্মবেশে নানা জায়গায় অনুসন্ধান করে ফিরতে লাগলো বনহুর নিজে। শুধু বনহুর নয়, তার বিভিন্ন আস্তানা থেকে তার অনুচরগণ ছড়িয়ে

পড়লো চারিদিকে। কিন্তু মনসুর ডাকুর পাতালপুরীর খোঁজ পাওয়া গেলো না।

বনহুর আশ্চর্য হলো, মনসুর ডাকুর পাতালপুরীর সেই অন্ধ গহ্বর কোথায় আছে কে জানে।

❑

আস্তানা থেকে বনহুর বেরিয়ে পড়লো কাউকে কিছু না বলে এমন কি রহমান বা নূরীও জানলো না কোথায় গেছে বনহুর।

বনহুর তখন কান্দাই পর্বতের গা বেয়ে তাজের পিঠের উপরে উঠে যাচ্ছে। দুর্গম পথ যে কোনো মূহূর্তে তাজের পা পিছলে গেলে আর বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না।

পর্বতের গা বেয়ে যতদূর উপরে উঠা যায় তাজের পিঠে উঠবে তারপর তাজকে রেখে পায়ে হেঁটে উঠবে সে। কান্দাই পর্বতের যে অংশে বনহুর এখন চলেছে সেদিকে কেউ কোনো দিন যায়নি। সম্পূর্ণ বিপরীত দিক এটা। লোকমুখে শোনা যায় কান্দাই পর্বতের এদিকে নাকি একটা জন্তু বাস করে। সে জন্তুর আকার কেউ কোনো দিন দেখেনি, তবে পায়ের ছাপ দেখেছে—ঠিক যেন হাতীর পা বা থামের ছাপ কিন্তু একটি ছাপই পরিলক্ষিত হয়—দুটি নয়। অনেক লোক বলে, জীবটার একটিমাত্র পা এবং সে নাকি লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। একটি বিরাট লেজও নাকি আছে জীবটার। কারণ পায়ের ছাপের পাশে দেখা যায় সাপের মত একটা রেখাচিহ্ন।

বনহুর তখন পর্বতের গা বেয়ে প্রায় পাঁচ শত ফুটের বেশি উপরে উঠে গেছে তখন হঠাৎ এই রকম পদচিহ্ন এবং লেজের দাগ তার নজরে পড়লো। বনহুর ভয় না পেলেও ভিতরে ভিতরে একটু শিউরে উঠলো—প্রাণের ভয় কার না আছে। তবু বনহুর অগ্রসর হলো, একটু পূর্বে বনহুর তাজকে ছেড়ে দিয়েছে এখন সে পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলেছে। গুলীভরা রিভলভার আর সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা তার কোমারের বেল্টে শরীরে জমকালো ড্রেস, মাথায় পাগড়ি।

বেলা গড়িয়ে এলেও সূর্যের তাপ এখনও আগুন ছড়াচ্ছে। দর দর করে ঘাম ঝরছে বনহুরের দেহ থেকে। তবু ক্লান্তির চিহ্ন নেই তার চোখেমুখে। এগিয়ে চলেছে বনহুর, চোখেমুখে তার কঠিন শপথ—নূরকে খুঁজে বের করতেই হবে।

বনহুর গোপন কোনো সূত্রে জানতে পেরেছে—মনসুর ডাকুর পাতালপুরীর সুড়ঙ্গমুখ আছে কান্দাই পর্বতের কোনো এক গুহায়। সে গুহারমুখ কান্দাই পর্বতের নিচে নয়—উপরে। কত উপরে তা জানে না বনহুর।

সন্ধান করে চললো বনহুর সে গুপ্তগুহামুখ। কখনও হামাগুড়ি দিয়ে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে, কখনও পাথরের চাপ সরিয়ে দেখছে। কোথাও বা গভীর গর্তের মত দেখে লতার শিকড় ধরে ভিতরে নেমে যাচ্ছে কিন্তু সুড়ঙ্গ না পেয়ে আবার তাকে ফিরে আসতে হচ্ছে।

হঠাৎ বনহুর একটা শব্দ শুনতে পেলো চিঁ হিঁ চিঁ হি--চমকে ফিরে তাকালো বনহুর—বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলো সে নিচে পর্বতের গা বেয়ে উপড়ে উঠে আসছে সেকি ভীষণ বিকট চেহারার এটি কালো জন্তু। মুখটা ঠিক কুমীরের মত মস্ত মস্ত সাদা দাঁতগুলো সূর্যের আলোতে ঝকঝক করছে। চোখদুটো জন্তুটার দেহের তুলনায় খুব বড় নয় তবু একটা ফুটবলের চেয়েও কম নয়। আগুনের গোলার মত জ্বলছে চোখ দুটো। দেহের আকৃতি ঠিক কুমীরের দেহের মতই কতকটা। জন্তুটা থপ্থপ্ করে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে। মস্তবড় একটা মোটা লেজ গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে জন্তুটার পিছনে পিছনে।

বনহুর মুহূর্তে রিভলভার খুলে নিলো হাতে। জন্তুটা তাকে দেখতে পেয়েছে নিশ্চয়ই। দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। বনহুর বড় একটা পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে রিভলবার ঠিক রাখলো।

জন্তুটা ভীষণভাবে চিঁহি চিঁহি শব্দ করতে করতে পর্বতের উপরে উঠে আসছে। এই ধরনের একটা জীব সে দেখেছিলো একবার সিন্ধি জঙ্গলে—কি ভয়ঙ্কর ছিলো। সে জীবটা কিন্তু তার মুখাকৃতি ঠিক গরিলারমত ছিলো। সেই জীবটার ছিলো একটিমাত্র চোখ।

বনহুর রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে। জীবটা ক্রমাগত গড়িয়ে গড়িয়ে কখনও বা লাফিয়ে উপরে উঠে আসছে। মাঝে মাঝে অশ্বের মত চিঁহি চিঁহি এক অদ্ভুত শব্দ করছে।

বনহুরের নিজের চেয়ে বেশি চিন্তা হলো তাজের জন্য। জীবটা তাজকে তো হত্যা করে ভক্ষণ করেনি? কিন্তু এখন ভাববার সময় নেই, হয় মৃত্যু নয় জীবন রক্ষা।

জীবটা একেবারে নিকটে এসে পড়েছে বনহুরকে দেখতে পেয়ে লেজ আছড়াচ্ছে কেমন যেন ভয়ানকভাবে দুলে দুলে উঠছে পর্বতের পাথরগুলো।

জীবটার নাসিকাধ্বনি বনহুর এবার স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। ফোঁস ফোঁস করে শব্দ হচ্ছে, একরকম বিদঘুটে শব্দ।

বনহুর যে পাথরটার আড়ালে আত্মগোপন করেছিলো, জীবটা সেই পাথর ধরে টেনে তুলে ফেললো। বনহুর তখন জীবটার পদ তলে লিলিপুটের মত লাগছে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে বনহুর রিভলভার থেকে গুলী ছুঁড়লো জীবটার তলপেট লক্ষ্য করে। একটি নয় পর পর তিনটা গুলী ছুঁড়লো সে।

জীবটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো ভূতলে বনহুর পুনরায় দুটো গুলী জীবটার বুক লক্ষ্য করে ছুড়ে মারলো। বনহুর ভাবতেও পারেনি, জীবটার শরীরে গুলীবিদ্ধ হবে। কারণ জীবটার দেহের খোলস কুমীরের চামড়ার চেয়েও অত্যন্ত বেশি শক্ত ছিলো।

বনহুরের অনুমান মিথ্যা নয়, জীবটার শরীরের চামড়া অত্যন্ত মজবুত তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তলপেটের চামড়া ছিলো খুব তুলতুলে নরম। বনহুরের রিভলভারের গুলী সঙ্গে সঙ্গে বিদ্ধ হয়েছে জীবটার পেটে। জীবটা যে এত সহজে নিহত হবে ভাবতে পারেনি বনহুর।

জীবটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো, তারপর গড়িয়ে যেতে লাগলো নিচের দিকে। তখনও জীবটা ছটফট্ করেছে। বনহুর তাকিয়ে আছে বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টি মেলে।

কিছুদূর গড়িয়ে গিয়ে হঠাৎ একটা পাথরের গায়ে আটকে গেলো জীবটা। বনহুর দেখলো, এবার জীবটা নড়ছে না একটুও। বুঝতে পারলো সে, জীবটা চিরদিনের জন্য নীরব হয়ে গেছে।

বনহুর এবার নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো। আবার সে সুড়ঙ্গমুখের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করলো। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বনহুর ভাবছে শয়তান মনসুর ডাকুর কাছে তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হবে পুত্রের জীবনের বিনিময়ে। না সে পরাজয় স্বীকার কারো কাছে করেনি কোনেদিন, আজ সে সামান্য এক ডাকুর কাছে কিছুতেই মাথা নত করবেনা। খুঁজে বের করবেই বনহুর তার পাতালপুরীর সুড়ঙ্গমুখ।

বনহুর এখন পর্বতের উপরে, অনেক উপরে উঠে এসেছে। এখান থেকে মৃত জীবটা আর নজরে পড়ছে না। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমান্বয়ে গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে আসছে। এবার বনহুর বসে পড়লো একটা পাথরের গায়ে ঠেশ দিয়ে ক্লান্তি আর অবসাদে দেহটা এলিয়ে পড়ছে তার। পর্বতের সুউচ্চ শিখরে পৌঁছতে তাকে বহু পরিশ্রম করতে হয়েছে।

অল্পক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়লো বনহুর।

কুয়াশাঘন আকাশ যেন নেমে আসছে ধীরে ধীরে তার মাথার উপর।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে খেয়াল নেই বনহুরের হঠাৎ সে অনুভব করলো কে বা কারা তাকে মজবুতভাবে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেছে। চোখ মেলে তাকাতেই লক্ষ্য করলো, কতকগুলো জমকালো ছায়ামূর্তিকে শূন্যে তুলে নিলে। এরা কারা? মানুষ তো বটেই। তবে কি মনসুর ডাকুর লোক তাকে অনুসরণ করছিলো এতক্ষণ? নিশ্চয়ই তাই হবে না হলে সে এখানে আছে কেমন করে জানলো তারা? তাকে যে কৌশলে বেঁধে ফেলেছে সেটাও অত্যন্ত সাবধানে তাতে কোনো ভুল নেই। বনহুর যদি একটু টের পেতো তাকে এত সহজে বেঁধে ফেলার সাধ্য ছিলো না কারো।

বনহুরকে যখন লোকগুলো বয়ে নিয়ে চললো তখন সে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ রইলো। আশ্চর্যও কম হয়নি বনহুর কারণ গভীর রাতে এভাবে তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে এরা? কারো মুখে কোনো কথা নেই। অতি সাবধানে, সতর্কতার সঙ্গে এগুচ্ছে লোকগুলো। হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেলে মৃত্যু অনিবার্য জানে তারা।

বুঝতে পারলো বনহুর, এদের গন্তব্য স্থান এই পর্বতেরই কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গায়, যেখানে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

লোকগুলো বনহুরসহ পর্বতের গা বেয়ে কখনও উপরে কখনও নিচে নেমে চলেছে। যদিও অন্ধকার ছিলো তবু অস্পষ্টভাবে বনহুর সব দেখতে পাচ্ছিলো। সে পথ চিনে নিচ্ছিলো অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একটা উচু শিখরের পাশে এসে ওরা দাঁড়ালো, এখানে পর্বতের গা অত্যন্ত খাঁড়া। বনহুর লোকগুলোর কাঁধে থাকলেও তার শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো। কোনোক্রমে এক জনের পা পিছলে গেলে মৃত্যু নিশ্চিত। সবগুলোই মরবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ বনহুরকে মজবুত করে বেঁধে চার পাঁচজন মিলে বয়ে নিয়ে চলেছিলো।

বনহুর অসহায়ের মত চুপচাপ রয়েছে, কোনো কথা বলে ফল হবে না সে জানে, কাজেই নীরবে সব দেখে যাচ্ছিলো। আশ্চর্য, এখন পর্যন্ত ওরা কোনো কথা উচ্চারণ করেনি মুখ দিয়ে। সবাই ইংগিতপূর্ণ একটা শব্দ করছিলো মাঝে মাঝে।

বনহুর এটাও বুঝতে পেরেছিলো এরা যে দলের লোকই হোক অত্যন্ত সুচতুর কিংবা সর্দারের মানা আছে কথা বলা।

এবার বিস্মিত হয়ে দেখলো বনহুর একটা বড়মত পাথরের চাপের পাশে এসে দাঁড়ালো ওরা তাকে নিয়ে। কৌশলে পাথরখানা সরিয়ে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো একটা সুড়ঙ্গমুখ।

বনহুরকে নিয়ে লোকগুলো সেই সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করলো। সুড়ঙ্গমধ্যে খাড়া সিঁড়ি পথ সোজা নেমে গেছে নিচের দিকে। লোকগুলো বনহুরের দেহটা বয়ে নিয়ে নামতে লাগলো নিচের দিকে।

সুড়ঙ্গমধ্যে কোনো আলো ছিলো না, তাই লোকগুলো মশাল জ্বেলে নিয়েছিলো। বনহুর লোকগুলোর কাঁধে থেকে সব লক্ষ্য করে চললো—সুড়ঙ্গটা সোজা পর্বতের অভ্যন্তরে নেমে গেছে। এবার বনহুরকেএকটা প্রশস্ত জায়গায় এনে নামিয়ে ফেললো ওরা। সঙ্গে সঙ্গে বনহুর শুনতে পেলো গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর—এতসহজে তোমরা কার্যোদ্ধার করতে পারবে কিছুতেই ভাবতে পারিনি রঘুলাল।

বনহুরের এ কণ্ঠ অতি পরিচিত মনসুর ডাকুর গলার আওয়াজ বুঝতে পারলো সে। বনহুরকে ওরা নামিয়ে তার হাত-পা এবং মুখের বাঁধন খুলে দিলো।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো তার মুখোভাবে কোনো বিস্ময় বা ভয়-ভীতি নেই। স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো চারিদিক, যেন সে আমন্ত্রিত অতিথি।

মশালের আলোতে বনহুর ঘুরে ফিরে দেখে নিলো তারপর ফিরে তাকালো মনসুর-ডাকুর দিকে।

বনহুর যখন স্বাভাবিক মুখোভাবে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখছিলো তখন মনসুর ডাকু এবং তার অনুচরগণ অবাক হয়ে গিয়েছিলো—তারা ভেবেছিলো দস্যু বনহুরের বন্ধন মুক্ত করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ আকার ধারণ করবে। তাই মনসুর ডাকু সূতীক্ষ্ণধার অস্ত্র হাতে প্রস্তুত ছিলো এবং তার অনুচরগণও তৈরি হয়ে নিয়েছিলো সাবধানে।

মনোযোগ সহকারে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো বনহুর-এটাই তোমার পাতালপুরীর আস্তানা? চমৎকার কিন্তু--হাসলো বনহুর।

মনসুর ডাকু ক্রুদ্ধকণ্ঠে গর্জে উঠলো—বনহুর তুমি এখন স্বাধীন নও, এ কথা মনে রেখো।

তুমিও ভুলে যেও না মনসুর, তুমিও এখন মুক্ত নও। কারণ দস্যু বনহুর এখন পাতালপুরীতে সশরীরে উপস্থিত রয়েছে।

বনহুর।

হাঁ মনসুর। আমি যদি স্বেচ্ছায় তোমার এখানে না আসতাম তাহলে তোমার অনুচরদের সাধ্য ছিলো না আমাকে এখানে নিয়ে আসে।

মনসুর ডাকু গর্জে উঠলো—জানো এই মুহূর্তে তোমাকে হত্যা করতে পারি?

সেটা তোমার দুঃসাহস মনসুর কিন্তু পারবে না।

বনহুর, তোমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসিনি। তোমাকে এনেছি হত্যা করার জন্য--

তাহলে এতক্ষণ নিশ্চুপ তামাশা দেখছো কেন? হত্যা করো আমাকে।

এত সহজে তোমাকে হত্যা করবো না বনহুর। তোমার মৃত্যু হবে অতি যন্ত্রণাদায়ক যা তুমি নিজেও কল্পনা করতে পারো না।

তাই নাকি?

হাঁ কিন্তু তার পূর্বে তোমার পুত্রকে তোমার চোখের সম্মুখে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হবে, তারপর তোমাকে---হোঃ হোঃ হোঃ---অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়ে মনসুর ডাকু।

বনহুর এবার গম্ভীর কণ্ঠে বলে—মনসুর তুমি বলেছিলে আমাকে পেলে আমার সন্তানকে তুমি মুক্তি দেবে?

তোমার সন্তানকে মুক্তি দেবো আমি? তোমাকে আয়ত্তে আনার জন্যই তোমার সন্তানকে বন্দী করে রেখেছি, এবার তোমাকে হাতের মুঠায় পেয়েছি। দু'জনাকে একসঙ্গে পুড়িয়ে মারবো। রঘুলাল?

বলুন সর্দার?

বনহুর আর তার সন্তানকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হবে, যাও তার ব্যবস্থা করো।

রঘুলাল মাথা নত করে চলে গেলো।

বনহুর তাকালো তার চারপাশে —অগণিত জোয়ান উদ্যত বর্শা হাতে তাকে ঘিরে রেখেছে।

মনসুর ডাকু তার হাতের ছোরাখানা বারবার নাড়াচাড়া করছে, মনোভাব যে কোনো মুহূর্তে ছোরাখানা নিক্ষেপ করে হত্যা করতে পারে বনহুরকে।

বনহুর স্থির কণ্ঠে বললো—নূর কোথায়?

মনসুর ডাকু বললো—অল্পক্ষণেই তার সাক্ষাৎ লাভ ঘটবে, কিন্তু

বলো, থামলে কেন?

তাকে কাছে পাবে না।

জানি তোমার সে সাহস নেই।

ও, অহঙ্কার দেখছি কমেনি তোমার?

বেশি কথা বলোনা মনসুর, যা করতে চাও করো।

কয়েক ঘন্টা পরে তোমাকে আর তোমার পুত্রকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হবে।

বেশ, তাই করো। শান্ত ধীরস্থির বনহুরের কণ্ঠস্বর।

❑

পাতালপুরীর অন্ধ গহ্বরে দু'হাটুর মধ্যে মাথা রেখে বসেছিলো বনহুর। মনসুর ডাকু তাকে আটক করে রেখেছে—যে কোনো সময় তাকে এবং তার পুত্র নূরকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হবে।

দস্যু বনহুরকে বন্দী করতে সক্ষম হবে, এ যেন মনসুর ডাকুর কল্পনার বাইরে ছিলো। যাকে পুলিশ মহল পারেনি বন্দী করে রাখতে যাকে দস্যু দুর্গাদাস পারেনি পরাজিত করে বন্দী করতে যাকে মন্থনা দ্বীপের জংলী সরদার হিন্দিল সিং পারেনি হত্যা করতে তাকে কিনা অতি সহজে মেষ শাবকের মত পাকড়াও করে আনতে সক্ষম হয়েছে মনসুর ডাকুর অনুচরগণ।

মনসুর ডাকুর পাতালপুরীর আড্ডাখানা আনন্দ আর খুশিতে ভরে উঠেছে। শরাব ও আরও বিভিন্ন নেশা পানে মেতে উঠেছে সবাই। মনসুর ডাকু তার অনুচরদের মধ্যে বহু সোনাদানা এবং অর্থ পুরস্কার দিলো কারণ তাদের বুদ্ধি-কৌশলেই আজ মনসুর ডাকু দস্যু বনহুরকে করায়ত্ত করতে পেরেছে।

বনহুর বসে বসে ভাবছে কিছু, এমন সময় অন্ধগহ্বরের মেঝের পাথর যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে বলে মনে হলো তার। বনহুর মেঝের পাথরে কান লাগিয়ে শুনতে পেলো একসঙ্গে কতকগুলো খুরের আওয়াজ। অনেকগুলো ঘোড়া যেন একসঙ্গে চলে যাচ্ছে বলে মনে হলো তার। বুঝতে বাকি রইলো না বনহুরের এই পাতালপুরীর শুধু একটি মাত্র পথই নয়, আরও একটি পথ আছে যে পথে মনসুর ডাকুর অনুচরগণ ঘোড়া নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে এবং বাইরে বের হতে পারে। এখন যে আওয়াজ বনহুর শুনতে পাচ্ছে তা মনসুর ডাকুর অনুচরগণের অশ্বের খুরের আওয়াজ তাতে কোনো ভুল নেই।

বনহুরের মুখমন্ডলে একটা খুশির ভাব খেলে গেলো, সে অন্ধকারে তাকালো সম্মুখের দিকে। জমাট অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়লোনা। একটা অসহায় কচি মুখ ভেসে উঠলো তার মনের আকাশে—না

জানি নূরের কি অবস্থা করেছে ওরা। কোথায় তাকে কিভাবে রাখা হয়েছে কে জানে! হয়তো বা ক্ষুধায় কত কেঁদেছে পিপাসায় কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে, নর শয়তান মনসুর তাকে হয়তো কিছু খেতে দেয়নি, দেয়নি একফোঁটা পানি--- বনহুরের চোখ দুটো অন্ধকারে আগুনের মত জ্বলে উঠলো। দাঁতে দাঁত পিষে বললো—এর প্রতিশোধ নেবো মনসুর! ক্ষমা করেছিলাম—তুমি তার প্রতিদানই দিচ্ছো ---আপন মনেই হাসে বনহুর—হাঃ হাঃ হাঃ দস্যু বনহুরকে তুমি শায়েস্তা করবে---হাঃ হাঃ হাঃ ----

পাতালপুরীর অন্ধ গহ্বরে পাথরগুলো যেন থরথর কেঁপে উঠলো বনহুরের হাসির শব্দে।

বেশ কয়েকটা ঘন্টা অন্ধকারে বসে বসে হাঁপিয়ে উঠেছিলো বনহুর। একটু নিদ্রা ভাব আসছে তার, ঠিক সেই মুহূর্তে আবার সেই শব্দ। বনহুর বুঝতে পারলো, মনসুর ডাকু দস্যুতা করে ফিরে এলো। বনহুর অনুমান করে নিলো, তার গুহা থেকে বেশ কিছুদূর দিয়ে এই সুড়ঙ্গপথটা হবে। কোনোক্রমে বনহুর একবার ছাড়া পেলে সে দেখে নেবে সবাইকে।

মনসুর ডাকু ফিরে এলো, আর এলো তার সঙ্গী সাথীরা সবাই। এক এক জনের অশ্বপৃষ্ঠে এক একটা বোঝা, মূল্যবান আসবাবপত্র, সোনা-দানা আর অর্থের গাদা।

মনসুর ডাকুর সম্মুখে স্তূপাকার করে রাখলো ওরা। রক্তে রাঙা ছোরা আর বল্লমগুলো পরিষ্কার করতে লাগলো ছেঁড়া কাপড়ে মুছে মুছে। রাইফেল পিস্তলগুলোও পরিষ্কার করতে লেগে গেলো সবাই। বহু লোককে তারা হত্যা করেছে লুটে নিয়েছে তাদের মালপত্র।

শুধু কি আজ—এমনি কতকাল থেকে মনসুর ডাকু পাতাল গহ্বরে আত্মগোপন করে আচমকা কোনো গ্রামে হানা দিয়ে নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা করে তাদের যথাসর্বস্ব লুটপাট করে নিতো। পুলিশ মহল কিছু করতে তো পারতোই না, এমনকি দস্যু কালু খাঁ পর্যন্ত হাঁপিয়ে উঠতো মনসুর ডাকুর আচরণে। মনসুর ডাকু আর কালু খাঁর মধ্যে ছিলো চরম বিবাদ—এক দস্যু আর এক দস্যুকে সমীহ করবে না একটা স্বাভাবিক এবং এ কারণেই এই দুই দস্যু সম্রাটের মধ্যে ছিলো প্রতিহিংসার বহ্নিজ্বালা।

মনসুর ডাকুর অহঙ্কার সেই বড় ডাকু আর কালু খাঁ জানতো তার সমান দস্যু নেই আর কেউ। অবশ্য দু'জনাই শক্তি বুদ্ধিতে প্রায়ই সমান ছিলো তবু মনসুর ডাকুকে দস্যু কালু খাঁ কয়েকবার নাকানি চুবানি খাইয়ে ছেড়েছিলো তাই মনসুর ডাকুর এত রাগ হলো কালু খাঁর উপর।

কালু খাঁর কাছে কয়েকবার অপমানিত হওয়ার পর মনসুর ডাকু সব সময় তাকে শায়েস্তা করার চেষ্টা করে আসছিলো কিন্তু সে কিছুতেই তাকে আয়ত্তে আনতে পারেনি বরং নিজেই নাজেহাল পেরেশান হয়ে পড়েছিলো। সেই রাগ ছিলো তার মনে বহুকাল ধরে, কিন্তু কালু খাঁর উপর সে কোনো হস্তক্ষেপই করতে পারেনি। আজ তার সেই রাগ চরমে উঠেছে, কালু খাঁর প্রতিশোধ নেবে সে তার পুত্র বনহুরের উপর। বনহুরকে ধ্বংস করাই হলো মনসুর ডাকুর মূল উদ্দেশ্য।

বনহুরকে হত্যা করার জন্য মনসুর ডাকুর পাতালপুরীর আড্ডা খানায় ভীষণ তোড়জোড় শুরু হলো। একস্থানে স্তূপাকার করা হলো শুকনো কাঠ, উপরে একটা মঞ্চ—সেই মঞ্চের মাঝখানে পোঁতা আছে একটি লৌহ থাম। এই থামের সঙ্গে বনহুরকে মজবুত রশি দিয়ে বাঁধা হবে, তারপর আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে শুকনো কাঠে।

বনহুরকে যেখানে অগ্নিদগ্ধ করা হবে সেই মঞ্চের পাশেই একটা মঞ্চে হাত-পা বাঁধা থাকবে নূর। তার দেহেও অগ্নিসংযোগ করা হবে।

এই কয়েকদিনের মধ্যে বনহুরের সম্মুখে নূরকে আনা হয়নি। হত্যার দিন পিতা পুত্রকে একত্রিত করা হবে। বনহুর আপন মনেই গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে।

আর মাত্র একটা দিন বাকি কাল সকালে বনহুর আর নূরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হবে।

বনহুরকে যখন বন্দী করা হয়েছিলো এমন কি তার পা থেকে জুতো জোড়াও খুলে নিয়েছিলো শয়তান মনসুর ডাকুর অনুচরগণ।

কিন্তু তারা জানতো না বনহুরের বাজুতে যে ছোট্ট কবজটি আছে তার মধ্যে রয়েছে ক্ষুদে ওয়্যারলেস্। বনহুর গভীর রাতে অন্ধকার গুহায় বসে বাজুর কবজের মুখ খুলে সেটা তুলে ধরলো মুখের কাছে।

রহমানকে বনহুর পথের নির্দেশ জানিয়ে দিলো। সে এখন কোথায় আছে, কিভাবে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। নূরের কথাও জানালো বনহুর সংক্ষেপে—তাকে এখন পর্যন্ত সে দেখেনি। কাল তাকে এবং নূরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হবে, এ কথাও জানালো বনহুর।

রহমান মূহূর্ত বিলম্ব না করে তৈরি হবার জন্য তার দলবলকে আদেশ করলো। রাত্রির অন্ধকারেই তাদের রওয়ানা দিতে হবে।

নূরী জানতে পারলো না কিছু। রহমান তাকে জানালো না কারণ সে জানলে কিছুতেই নিশ্চুপ রইবে না যেতে চাইবে তাদের সঙ্গে। নূরী অন্তঃসত্ত্বা কাজেই তাকে নেওয়াও সম্ভব হবে না।

রহমান এবং বনহুরের অন্যান্য অনুচর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিলো জমকালো পোশাক আর মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় ভয়ঙ্কর লাগছে তাদের।

রহমান অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসে বললো—ভাইগণ। আমাদের জীবন পণ করে আজ এ যাত্রা! হয় সর্দারের মুক্তি না হয় মৃত্যু। সবাই নিজ নিজ অস্ত্র হাতে রেখে মাথানত করে জীবন পণ শপথ করে নিলো। তারপর অন্ধকার ভেদ করে জেগে উঠলো অসংখ্য অশ্বপদশব্দ।

গহন জঙ্গল অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে রহমান ও তার সঙ্গিগণ। অশ্ব খুরের শব্দে বনভূমি যেন প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে। এক এক জনের ধমনির রক্তে যেন আগুন জ্বলে উঠেছে। কোনোদিকে কারো খেয়াল নেই সর্দারকে উদ্ধার করতেই হবে।

❑

একটা কচি গলার আর্তকণ্ঠে চমকে ফিরে তাকালো বনহুর। দেখলো তার গুহার মধ্যে দু'জন বলিষ্ঠ লোক মশাল হাতে এসে দাঁড়িয়েছে। আরও দু'জন বলিষ্ঠ ভীষণ চেহারার লোক নূরকে ধরে আছে শক্ত করে। নূর আর্তনাদ করে উঠছে মাঝে মাঝে।

বনহুর ফিরে তাকাতেই তার দু'চোখ যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলো নূরের একি অবস্থা হয়েছে। জীর্নশীর্ণ হয়ে গেছে তার কচি দেহখানা। কোঁকড়ানো

চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে কপালের চারপাশে। চোখ দুটো বসে গেছে কালো হয়ে গেছে মুখখানা। সমস্ত দেহে আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান। গায়ের জামা ছিঁড়ে গেছে, পিঠের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে—চাবুকের আঘাত কালো হয়ে আছে সেখানে। কতদিন স্নান করেনি, গায়ের চামড়ায় ময়লা জমে আছে। বনহুরের বুকের মধ্যে যেন মোচড় দিয়ে উঠলো, অতিকষ্ঠে নিজকে সংযত করে নিলো সে।

মশালের আলোতে নূর বনহুরকে স্পষ্ট দেখতে পেলো। মোটা মোটা শিকের ওপাশে তার আব্বুকে দেখে আর্তকণ্ঠে ডেকে উঠলো—আব্বু আব্বু -

সঙ্গে সঙ্গে মনসুর ডাকু এসে দাঁড়ালো নূরের পিছনে দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরলো নূরের চুলের গোছা—চুপ। সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো আবার—পুড়িয়ে মারবো বাপ বেটা দু'জনাকে কেঁদে কোনো ফল হবে না।

নূর ভয়ার্ত চোখে অসহায়ভাবে মনসুর ডাকুর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো—আব্বু ওরা আমাকে মেরে ফেললো--পানি একটু পানি খাবো আব্বু"।

মনসুর ডাকুই বললো—রঘুলাল যাও ওকে পানি এনে দাও!

রঘুলাল নূরকে ধরে ছিলো সে নূরের একখানা হাত মুক্ত করে দিয়ে চলে গেলো।

নূর পিতার দিকে হাত বাড়িয়ে কেঁদে উঠলো—আব্বু, আব্বু---

নূরের আর একখানা হাত আর একজরন বলিষ্ঠ দস্যুর হাতের মুঠায় থাকায় একচুল সে এগুতে পারলো না। ব্যাকুল কণ্ঠে পিতাকে সে ডাকতে লাগলো।

বনহুর চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে বের হচ্ছে তার। নূরের চেহারা দেখে তার হৃদয় যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিলো কিন্তু সে একটি শব্দও উচ্চারণ করলো না।

নূর ক্ষুধায় পিপাসায় এত কাতর হয়ে পড়েছিলো যে দাঁড়াবার শক্তিটুকু যেন ছিলো না তার। থরথর করে কাঁপছিলো তার দেহটা। কণ্ঠ ক্ষীণ করুণ শোনাচ্ছিলো। বনহুর রক্তচক্ষু নিক্ষেপ করে তাকাচ্ছিলো একবার মনসুর

ডাকু এবং একবার নূরের দিকে। বারবার দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হচ্ছিলো দাঁত পিষছিলো সে আপন মনে।

এমন সময় রঘুলাল আর একজন অনুচরসহ পানির পাত্র নিয়ে হাজির হলো।

বনহুর বন্দী হবার পর তাকেও তেমন কোনো খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হয়নি তবু সে কাবু বা কাতর নয়। কিন্তু নূর আট-দশ রছরের ছোট্ট ছেলে কি করে সহ্য করবে। তাকেও কিছু খেতে দেওয়া হয়নি, তবে নূরকে জীবিত রাখার জন্য মাঝে মাঝে শুকনো রুটি খেতে দিতো শয়তান মনসুর ডাকু দল।

মনসুর ডাকুর ইংগিতে অনুচরের হাত থেকে পানির পাত্র নিয়ে রঘুলাল নূরের সম্মুখে এগিয়ে ধরলো।

পিপাসায় কাতর নূর ব্যাকুলভাবে হাত বাড়ালো পানির পাত্র নিয়ে পানি পান করার আশায়।

সঙ্গে সঙ্গে রঘুলাল পানির পাত্র সরিয়ে নিলো।

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো মনসুর ডাকু বাঁকা চোখে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। সে অনুভব করতে চায় ওর মধ্যে কেমন প্রতিক্রিয়া ঘটে।

পুনরায় রঘুলাল পানির পাত্র নূরের মুখের কাছে এগিয়ে ধরলো। নূর ব্যাকুলভাবে মাথাটা ঝুকে পানি পান করতে গেলো, অমনি রঘুলাল সরিয়ে নিলো পাত্রটা।

নূর পানি পানি বলে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো, তারপর ধপ করে বসে পড়লো মেঝের উপরে। হাত-পা আছড়ে কাঁদতে লাগলো নূর।

বনহুর তবু নিশ্চুপ।

আবার মনসুর ডাকুর আদেশে পানির পাত্র ধরা হলো নূরের সম্মুখে। বললো মনসুর ডাকু—নাও বাপু, এবার তুমি পেট ভরে পানি পান করো।

নূর মুহূর্তে কাঁদা ভুলে ঝুঁকে এলো পানির পাত্রের দিকে যেমন সে পানিতে মুখ স্পর্শ করতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে মনসুর ডাকু পানির পাত্রে পদাঘাত করলো। সঙ্গে সঙ্গে পানির পাত্রটা পাথরে পড়ে খান খান হয়ে ভেঙ্গে গেলো। পাথরের শুকনো মেঝেতে ছড়িয়ে পড়লো পাত্রের ঠাণ্ডা পানিগুলো।

এবার বনহুর নিশ্চুপ থাকতে পারলো না, সে বজ্রকঠিন হস্তে চেপে ধরলো বন্দীগুহার মোটা শিকগুলো। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে চাপ দিলো, অমনি বেঁকে গেলো একপাশে শিকগুলো।

বনহুর শিকের ফাঁক দিয়ে ক্রুদ্ধ সিংহের মত বেরিয়ে এলো দ্রুত গতিতে। ঝাঁপিয়ে পড়লো মনসুর ডাকুর উপর।

বনহুরের দেহের অসীম শক্তির পরিচয় পেয়ে কিছুক্ষণের জন্য কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলো মনসুর ডাকু এবং তার অনুচরগণ। বনহুর সর্দারকে আক্রমণ করতেই রঘুলাল ও আরও চারজন অনুচর আক্রমণ করলো একসঙ্গে বনহুরকে।

ভীষণভাবে ধস্তাধস্তি শুরু হলো।

বনহুর একা, নিরস্ত্র আর মনসুর ডাকু অস্ত্র হাতে তার অনুচরগণও নিরস্ত্র ছিলো না। বনহুর নিরস্ত্রভাবেই লড়াই করে চললো। প্রচণ্ড এক একটা ঘুষিতে ধরাশায়ী করতে লাগলো এক একজনকে। তাদের হাতের অস্ত্র ছিটকে পড়লো দূরে।

নূরতো একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। ভাবতে পারছে না সে। দূরে দাঁড়িয়ে নির্বাক আঁখি মেলে কম্পিত হৃদয়ে দেখছে সে পিতার অসীম বীরত্ব।

বনহুর সবাইকে পরাজিত করে মনসুর ডাকুর টুঁটি টিপে ধরলো। বজ্রকঠিন দুটি হাতে চেপে ধরলো ওকে মাটির উপর ফেলে।

রঘুলাল বিপদ সংকেত ঘন্টাধ্বনি করলো।

সঙ্গে সঙ্গে মনসুর ডাকুর অন্যান্য অনুচর উদ্যত অস্ত্র হস্তে ছুটে এলো। মুহূর্তে ঘিরে ফেললো বনহুরকে।

বনহুর তাকাতেই দেখলো তার চারপাশে উদ্যত অসংখ্য অস্ত্রবল্লম বর্শা, তরবারী, রাইফেল।

বনহুর নীরবে মনসুর ডাকুর বুক থেকে উঠে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গে বন্দী করা হলো তাকে।

নূর ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলো পিতার বুকে কিন্তু তার পূর্বেই ধরে ফেললো ডাকুর দল নূরকে। নূর ডুকরে কেঁদে উঠলো আব্বু--আব্বু।

বনহুরের হাতে-পায়ে তখন লৌহশিকল পরিয়ে তালা লাগানো হয়েছে। বন্দী সিংহের ন্যায় ফোঁস ফোঁস করছে বনহুর। রাগে তার দেহের মাংসপেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠেছিলো।

বনহুরকে বন্দী করার পর মনসুর ডাকু হেসে উঠলো ভীষণভাবে তারপর প্রচণ্ড একচড় বসিয়ে দিলো তার গালে—আমার আস্তানায় আমারী বন্দী হয়ে তুমি আমাকেই হত্যা করতে চেয়েছিলে। এবার কেমন করে তুমি জীবন বাঁচাও আর পুত্রকে রক্ষা করো দেখা যাক। এবার মনসুর ডাকু রঘুলালকে লক্ষ্য করে বললো—বাপ-বেটাকে নিয়ে যাও। আর বিলম্ব করা ঠিক হবে না, আজ ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে এদের আগুনে পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলো।

আচ্ছা সর্দার। রঘুলাল অনুচরদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বনহুর আর নূরকে নিয়ে চললো।

❑

মনসুর ডাকু একটা উচ্চ আসনে উপবিষ্ট, তার সম্মুখে দু'টি শুকনো কাঠের স্তূপ, স্তূপের মাঝখানে একটি লোহার থাম। বনহুরকে সেই থামের সঙ্গে মজবুত করে বেঁধে ফেললো ওরা। নূরকে যখন রশি দিয়ে বাঁধা হচ্ছিলো তখন সে চিৎকার করে রোদন করছিলো— আব্বু, ওরা আমাকে মেরে ফেললো আব্বু! ওরা আমাকে মেরে ফেললো...

বনহুর ধীরস্থির নীরব।

নূর ভেবে পাচ্ছে না তার আব্বু তার সঙ্গে কথা বলছে না কেন। কেন সে অমন নীরব হয়ে গেছে। নূরের কচি মনে আরও কত প্রশ্ন— তাকে এরা ধরে এনেছে, তার আব্বুকে আবার কি করে পাকড়াও করলো? তার আম্মিই বা কোথায় কে জানে? কিন্তু কে দেবে জবাব তার! কেঁদে কেঁদে নূরের গলা বসে গেছে, চোখ দিয়ে আর পানি বের হচ্ছে না। কাঁদতে খুব কষ্ট হচ্ছে ওর।

বনহুরকে শক্ত করে বাঁধা হলো।

এবার শুকনো কাঠে আগুন ধরিয়ে দেবার পালা।

❑

বন-প্রান্তর ভেদ করে তীর বেগে ছুটে আসছে রহমান দলবল নিয়ে। ভোর হবার পূর্বেই তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতে হবে। সর্দারের নির্দেশমত রহমান চলেছে। কান্দাই পর্বতের পিছন অংশে পৌঁছতে হবে। সেই অংশে আছে বিরাট একটা হ্রদ, হ্রদের দক্ষিণে একটা পথ আছে, সেই পথে অগ্রসর হয়ে কান্দাই পর্বতের তলদেশে প্রবেশের এক গোপন সুড়ঙ্গমুখ আছে। রহমান মাঝে মাঝে পথ চিনে নেওয়ার জন্য দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে দিক নির্ণয় করে নিচ্ছিলো।

এত দ্রুত অশ্ব চালনা করছিলো তারা যে, এক মুহূর্তে বহুদূর এগিয়ে যাচ্ছিলো। সর্বপ্রথম রহমানের অশ্ব দুলকী, পিছনে দলবল।

হ্রদের পাশে এসে দাঁড়ালো রহমান দলবল নিয়ে। দক্ষিণ দিয়ে একটা পথ নজরে পড়লো আধো অন্ধকারেও। রহমান সেই পথে এগুবার জন্য ইংগিত করলো।

বিরাট হ্রদের ওপারেই পর্বতের পিছন অংশ নজরে পড়লো। আশায়-উন্মাদনায় রহমানের মন নেচে উঠলো। এতক্ষণে তার মনে একটা ভরসা উঁকি দিয়ে গেলো। তাহলে ঠিক পথেই সে আসতে সক্ষম হয়েছে। সর্দার এবং নূরকে উদ্ধার করতে না পারলে আর সে ফিরে যাবে না শপথ করেছিলো।

রহমান দলবল নিয়ে এবার পর্বতের পিছন অংশ লক্ষ্য করে অগ্রসর হলো। যত কাছে মনে করেছিলো রহমান ঠিক তত কাছে নয় পর্বতের পিছন অংশ। পর্বতের পিছন অংশে পৌঁছতে বেশ বিলম্ব হয়ে গেলো তাদের।

তারপর সুড়ঙ্গমুখ খুঁজে বের করার পালা।

পর্বতের নিকটে পৌঁছে রহমান সুড়ঙ্গমুখ অন্বেষণ করে চললো।

ঠিক সেই মূহূর্তে হ্রদের ভিতর হতে বেরিয়ে এলো একটা অদ্ভুত জীব। রহমান আর তার দলকে আক্রমণ করে বসলো। এ জীবটা সেই ধরনের জীব যাকে বনহুর হত্যা করেছিলো কান্দাই পর্বতের সুউচ্চ শিখরের উপরে।

এই অদ্ভুত জীবগুলো হ্রদের জলের গভীর তলদেশে বাস করে— আবার মাঝে মাঝে খাদ্যের অন্বেষণে পর্বতের শিখরেও আরোহণ করে।

বনহুর সেদিন অতিকষ্টে জীবটার কবল থেকে রক্ষা পেলেও রহমান ও দলবল ভীষণ বিপদে পড়ে গেলো।

রহমান যতোই তাড়াতাড়ি করছিলো ততোই বিলম্ব ঘটলো তার।

জীবটা তেড়ে এলো ভীষণ হা করে।

রহমান এবং দলবল অস্ত্র নিক্ষেপ করে চললো অবিরত। জীবটার দেহে অস্ত্র লেগে কিছুই হচ্ছে না। তার দেহের চামড়া ভীষণ শক্ত ছিলো। জীবটার তলপেটের চামড়া ছিলো অত্যন্ত নরম, কোনোক্রমে যদি তার তলপেটে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারতো তাহলে রক্ষা পেতো ওরা।

মরিয়া হয়ে লড়াই করে চললো রহমান ও অন্য সবাই। এদিকে তাদের সময় অতি সংকীর্ণ। ঠিক সময়ে পৌঁছতে না পারলে সর্দার ও নূরকে কোনোক্রমে উদ্ধার করা যাবে না।

রহমান এমন অবস্থায় কোনোদিন পড়েনি, সে নিজে প্রাণপণে অস্ত্র নিক্ষেপ করে চলেছে জীবটাকে লক্ষ্য করে।

রাত ভোর হয়ে আসছে তখন।

রহমানের দল থেকে অশ্বসহ একজন অনুচরকে জীবটা ধরে ফেললো আচমকা, তারপর অতি সহজে সে নেমে গেলো হ্রদের পানিতে।

একজনকে হারালো রহমান ও দলবল। মনটা বড্ড মুষড়ে পড়লো, কিন্তু সে সব ভাববার সময় নেই। সর্দারের উদ্ধার নেশায় তারা উন্মাদ হয়ে উঠেছে। কিন্তু তারা ক্রমেই যেন হতাশ হয়ে পড়ছে। কারণ, সর্দার জানিয়েছিলেন, ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হবে। এতক্ষণেও তারা সুড়ঙ্গমুখ খুঁজে বের করতে সক্ষম হলো না।

রহমান ও দলবল যখন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে পর্বতের পাদমুখে একটি উচ্চস্থান হতে ভেসে এলো কঠিন তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠ— খবরদার, এক পা তোমরা অগ্রসর হবে না।

চমকে চোখ তুললো রহমান ও দলবল। সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত হলো সবাই। দেখলো তীর-ধনু হাতে উঁচু একটা স্থানে দাঁড়িয়ে আছে জমকালো পোশাক পরিহিতা একটি নারীমূর্তি। পোশাকটা ঠিক শিকারী ড্রেসের মত

দেখতে, মুখেও মুখোস রয়েছে। মূর্তিটি যেন নারী, তার কণ্ঠস্বরে বুঝতে পেরেছিলো রহমান ও দলবল।

রহমান রাইফেল উদ্যত করার পূর্বেই নারীমূর্তি তীর-ধনু উদ্যত করেছিলো তার বুক লক্ষ্য করে। কাজেই রহমান বাধ্য হলো ক্ষান্ত হতে।

রহমানই সর্বাগ্রে ছিলো, সে-ই কথা বললো প্রথমে— কে তুমি আমাদের বাধা দিচ্ছো?

নারীমূর্তি বললো— আমি যেই হই, বলো তোমরা কি জন্য এ পথে এসেছো?

রহমান সেই নারীকণ্ঠে যেন একটা ভরসার সুর শুনতে পেলো, ক্ষীণ একটা আশার আলো উঁকি দিলো তার মনে, বললো রহমান— জানি না তুমি কে। আমরা অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত, কারণ আমাদের সর্দার এই পর্বতের কোনো এক গহ্বরে বন্দী। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হত্যা করা হবে।

তোমাদের সর্দার?

হাঁ, আমাদের সর্দার।

কে?—কি তার নাম, বলো?

রহমান একটু ভেবে নিলো—মিথ্যা বলবে না সত্য বলবে? হঠাৎ তার কানের কাছে কে যেন বললো, সত্যের জয় সর্বক্ষণ। রহমান দীপ্তকণ্ঠে বললো— দস্যু বনহুর।

নারীমূর্তি অস্ফুট কণ্ঠে বললো—দস্যু বনহুর!

হাঁ। তুমি যদি আমাদের কোনোরূপ বাধা না দাও তাহলে সর্দারকে উদ্ধার করতে সক্ষম হবো।

নারীমূর্তি পুনরায় বলে উঠলো— আমি তোমাদের বাধা না দিলেও তোমরা সে পথ খুঁজে পাবে না। সত্যি কি তোমরা তোমাদের সর্দারের মঙ্গল চাও?

হাঁ হাঁ চাই এবং তার বিনিময়ে যা চাও তাই আমরা দেবো তোমাকে। রহমান কথাগুলো কাতর কণ্ঠে উচ্চারণ করলো।

নারীমূর্তির মনে হয়তো দয়ার উদয় হলো। সে নেমে এলো উঁচু থেকে। রহমান এবং দলবলকে অস্ত্র ত্যাগ করার জন্য আদেশ করলো নারীমূর্তি।

রহমান নারীমূর্তির আদেশ পালন করলো।

নারীমূর্তি বললো— তোমরা এসো আমার সঙ্গে।

❑

ভোর হবার পূর্ব মুহূর্তে বনহুর আর নূরকে এনে শুকনো কাঠ দিয়ে তৈরি মঞ্চের উপরে লোহার থামের সঙ্গে শিকল দিয়ে মজবুত করে বেঁধে ফেললো মননুর ডাকুর দল।

পাশাপাশি দুটি মঞ্চ।

বনহুরকে এত শক্ত করে বাঁধা হয়েছে যে, তার নড়বার কোনো উপায় নেই। মাথাটা ফিরিয়ে মাঝে মাঝে নূরের অবস্থা দেখে নিচ্ছে বনহুর।

নূর কেঁদে কেঁদে অবশ হয়ে গেছে, আর কোনো শব্দ উচ্চারণ করছে না সে। হয়তো বা নূর বুঝতে পেরেছে, কেঁদে আর কোনো ফল হবে না, তাই সে নিশ্চুপ দেখে যাচ্ছে!

মনসুর ডাকুর আনন্দ আর ধরছে না, দস্যু বনহুরকে আজ সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করছে, একটু পরেই তাকে ভস্মীভূত করে ফেলা হবে। শুধু বনহুর নয়, তার আদরের দুলাল নূরকেও ছাই-এ পরিণত করা হবে।

কিন্তু এত সহজেই বনহুরকে মনসুর ডাকু হত্যা করতে চায় না, তাকে জীবিত অবস্থায় আরও শাস্তি দিয়ে জর্জরিত করতে চায়। তারপর তাকে হত্যা করবে।

মনসুর ডাকু তার এক অনুচরকে আদেশ করলো একখানা চাবুক নিয়ে আসতে।

অল্পক্ষণেই চাবুক এলো।

মনসুর ডাকু চাবুকখানা তুলে নিলো হাতে। কি যেন ভেবে প্রথমে চাবুক হাতে নূরের দিকে এগুলো শয়তান ডাকু।

বনহুর বলে উঠলো— আমাকে মারতে ভয় পাচ্ছো, তাই কচি বাচ্চাটার দিকে এগুচ্ছো শয়তান।

কি বললে? থমকে দাঁড়ালো মনসুর ডাকু, রক্তচক্ষু মেলে বললো— তোমাকে মারতে ভয় পাবো আমি? আচ্ছা, তাহলে প্রথমে তোমার চামড়াটাই ছাড়িয়ে ফেলি! তারপর বাচ্চাটার...

মনসুর ডাকু মঞ্চের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো উপরে, ঠিক বনহুরের পাশে এসে দাঁড়ালো। মশালের আলোতে ওর হাতের চাবুকখানা সাপের চামড়ার মত চকচক করছে। মনসুর ডাকু এবার চাবুক চালাতে শুরু করলো ভীষণভাবে।

নূর আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলো, পিতার কষ্ট তার কচি মনে দারুণভাবে আঘাত করলো। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলতে চাইলো কিন্তু হাত দু'খানা তার পিছমোড়া করে বাঁধা থাকায় পারলো না, চোখ বন্ধ করলো সে।

বনহুরের জামা ছিঁড়ে ঝুলে পড়লো, পিঠের চামড়ার কালো রশির মত দাগ পড়ে গেলো। স্থানে স্থানে কেটে রক্ত বেরিয়ে পড়লো। সুন্দর মুখখানা যন্ত্রণায় রাঙা হয়ে উঠলো, বারবার চাবুকের আঘাত সে অধর দংশন করে সহ্য করে নিতে লাগলো। ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠলো।

মনসুর ডাকু চাবুক চালিয়ে চালিয়ে এক সময় ক্ষান্ত হলো। নূরের দিকে এগুতেই বনহুর বজ্রকঠিন স্বরে বললো— আমাকে হত্যা করার পর ওকে হত্যা করো মনসুর...

বেশ, মৃত্যুর পূর্বে তোমার কথাটা রাখলাম। রঘুলাল, এবার শুকনো কাঠে আগুন ধরিয়ে দাও। কথাগুলো বলে মনসুর ডাকু তার সুউচ্চ আসনে গিয়ে বসলো। তখনও তার দক্ষিণ হস্তে চাবুকখানা রয়েছে।

রঘুলাল সর্দারের আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন অনুচরের হাত হতে জ্বলন্ত মশালটা নিয়ে বনহুরের মঞ্চের দিকে অগ্রসর হলো।

আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড— তাহলেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে বনহুরের এবং নূরের চারপাশের শুকনো কাঠগুলো। শুধু শুকনো কাঠ নয়, কাঠে প্রচুর পরিমাণ তেল দেওয়া হয়েছে। আগুন একবার ধরলে ভস্ম না হয়ে যাবে না।

রঘুলাল যে মুহূর্তে জ্বলন্ত মশাল হাতে বনহুরের মঞ্চের দিকে এগুচ্ছিলো, সেই মুহূর্তে মনসুর ডাকু চাবুকখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলো দূরে। আনন্দে মনসুর ডাকুর চোখ দুটো জ্বলছে যেন।

মনসুর ডাকু বললো— রঘুলাল, এইবার মশালের আগুন ধরিয়ে দাও।

নূর আর্তনাদ করে উঠলো— না না, আমার আব্বুকে তোমরা পুড়ে মেরো না...

রঘুলাল বা মনসুর ডাকুর কানে সে শব্দ প্রবেশ করলো না, কারণ তারা হত্যার নেশায় মেতে উঠেছে।

রঘুলাল যেমন শুকনো কাঠে আগুন ধরিয়ে দিতে যাবে, অমনি আর্তনাদ করে উঠলো সে, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরপাক খেয়ে দু'পা পিছিয়ে এলো আচমকা, তারপর পড়ে গেলো উবু হয়ে। মশালটা পড়লো রঘুলালের দেহের উপর। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো ওর জামা-কাপড়।

মনসুর ডাকু এবং অন্যান্য অনুচর বিস্ময়ভরা চোখে দেখলো— রঘুলালের পিঠের মাঝখানে বিদ্ধ হয়ে আছে একটি তীর! রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝের পাথর। ততক্ষণে রঘুলালের জামা-কাপড়ে আগুন ধরে গেছে, কুঁকড়ে আসছে ওর দেহটা।

এ তীর কে নিক্ষেপ করলো? কোথা হতে এলো? সবাই তাকালো মনসুর ডাকুর পিছনে, কারণ সেই দিক থেকেই তীরটা এসে বিদ্ধ হয়েছিলো রঘুলালের পিঠে।

সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেছিলো বনহুর— সে স্পষ্ট দেখতে পেলো, মনসুর ডাকুর আসনের বেশ কিছু উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আছে একটি জমকালো ছায়ামূর্তি, তার হাতে তীর-ধনু রয়েছে।

মনসুর ডাকু আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়।

একসঙ্গে মনসুর ডাকু ও তার অনুচরগণ ফিরে তাকায় তার আসনের পিছন দিকে। সকলের চোখেমুখেই একটা অদ্ভুত বিস্ময় ভাব জেগে উঠলো।

তখন রঘুলালের দেহটা নীরব হয়ে গেছে কিন্তু সমস্ত দেহে তখন দপ্ দপ্ করে আগুন জ্বলছে।

মনসুর ডাকু কিছু বলবার পূর্বেই সেই জমকালো ছায়ামূর্তি একটা বাঁশিতে ফুঁ দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ থেকে ঘিরে এলো রহমানের দলবল, প্রত্যেকের হাতেই রাইফেল।

বনহুর বুঝতে পারলো, এ সবই রহমানের কাজ। মনে মনে খুশি হলো সে, বললো—সরাইকে বন্দী করে ফেলো রহমান।

মনসুর ডাকু ও তার অনুচরগণ অপ্রস্তুত এবং নিরস্ত্রভাবে দস্যু বনহুরকে হত্যার আনন্দ উৎসবে মেতে ছিলো— তারা ভাবতেও পারেনি, এই পাতালপুরীর গহ্বরে কেউ কোনোক্রমে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে। এ যেন মনসুর ডাকুর কল্পনার অতীত ব্যাপার।

রহমান দলবলকে আদেশ দিলো। মনসুর ডাকু এবং তার প্রত্যেকটা অনুচরকে বন্দী করে ফেলো।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের দুঃসাহসী অনুচরগণ মনসুর ডাকুর অনুচরদের বন্দী করতে গেলো কিন্তু সবাই লড়াইয়ের জন্য ক্ষেপে উঠলো, কিছুতেই তারা বন্দী হবে না।

তীর-ধনু উদ্যত করে বললো নারীমূর্তি— এক পা কেউ নড়োনা! যে যেখানে আছো নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকো। নইলে তোমাদের সর্দারকে আমি বিযাক্ত তীরবিদ্ধ করে হত্যা করবো।

মনসুর ডাকু এক পা নড়বার সাহসী হলো না, কারণ ঠিক তার পিছনেই দাঁড়িয়ে জমকালো মূর্তি বিষাক্ত তীর-ধনু নিয়ে। সম্মুখে রঘুলালের মৃতদেহটা আগুনে দগ্ধ হয়ে পোড়া কাঠের মত শক্ত হয়ে গেছে— সেকি এক ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্য!

রহমান সবাইকে বন্দী করে ফেললো, এমনকি মনসুর ডাকুও মুক্তি পেলো না। লৌহশিকলে আবদ্ধ হয়ে গর্জন করতে লাগলো মনসুর ডাকু। তারই পাতালপুরীর অন্ধ গহ্বরে সে-ই বন্দী হলো— রহমান বনহুরকে মুক্ত করে দিলো।

বনহুর ছুটে দিয়ে নূরের বাঁধন মুক্ত করে বুকে তুলে নিলো।

তারপর বনহুর নূরকে মাটিতে নামিয়ে এগিয়ে এলো মনসুর ডাকুর পাশে। রহমানের হাত থেকে রিভলভারখানা নিয়ে চেপে ধরলো ওর বুকে। দাঁতে দাঁত পিষে বললো— এবার শয়তান যাবি কোথায়? আর ক্ষমা নয়.....

সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠের প্রতিধ্বনি—থামো, মুক্তি পেয়েছো চলে যাও। একজনকেও তোমরা হত্যা করতে পারবে না।

বিস্মিত বনহুর তাকালো জমকালো পোশাক পরিহিত নারীমূর্তিটার দিকে, তার বিরাট প্রশ্ন— কে এই নারীমূর্তি?

❑

সর্দার, অদ্ভুত সে নারী........থামলো রহমান।

বনহুর বললো— সব তো শুনলাম, আশ্চর্য বটে। কিন্তু কে সেই নারী?

সর্দার, আরও আশ্চর্য যে, মনসুর ডাকু এবং তার একটি অনুচরকেও হত্যা করতে দিলো না।

বনহুর গম্ভীরভাবে উচ্চারণ করলো— হুঁ, বরং রহস্যময় মনে হচ্ছে।

রহমান বলেই চললো— একটিকেও জীবিত রাখা আমাদের উচিত ছিলো না, শয়তান মনসুর ডাকু পুনরায় শয়তানি করতে পারে।

করতে পারে মানে—করবেই এটা সুনিশ্চিত। মনসুর ডাকু এত সহজে আমার পিছু ত্যাগ করতে পারে না।

বনহুর আর রহমান কান্দাই জঙ্গলের নির্জন একটা জায়গায় বসে এসব কথাবার্তা বলছিলো। তাজ আর দুলকী অদূরে আপন মনে ঘাস ভক্ষণ করে চলেছে।

নূর এখন অত্যন্ত দুর্বল এবং অসুস্থ, তাই তাকে বনহুর নিজ আস্তানায় নূরীর হেফাজতে রেখে সুস্থ হয়ে উঠার অপেক্ষায় আছে, একটু সবল হলেই তাকে পৌঁছে দেবে মনিরার কাছে।

বনহুর আর রহমান গহন বনের মধ্যে বসে নিরিবিলি আলাপ-আলোচনা করছিলো। রহমানের মুখে সব শুনে বনহুর অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলো—কে সে নারী যার মহৎ হৃদয়ের প্রশংসা না করে পারা যায় না।

রহমান আরও বললো—সর্দার, সে আপনার নাম শুনামাত্র আর এক মূহূর্ত বিলম্ব না করে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। কিন্তু সে অতি সতর্কভাবে আমাদের চোখে পট্টি বেঁধে নিয়েছিলো, যেন আমরা পথটা চিনে না ফেলি।

হাঁ রহমান, আমিও আশ্চর্য হয়েছি......

দেখলেন তো, আবার বাইরে বের করে দেবার সময় আমাদের প্রত্যেকের চোখে পট্টি বেঁধেছিলো সে নিজের হাতে।

ঠিক সেই মূহূর্তে বনহুর আর রহমানের পায়ের কাছে ভূতলে একখানা তীরফলক এসে গেঁথে গেলো।

চমকে উঠলো একসঙ্গে বনহুর আর রহমান।

বনহুর তীরফলকটা হাতে তুলে নিয়েই অস্ফুট কণ্ঠে বললো— সেই নারী, যে মনসুর ডাকুর অগ্নিকুণ্ড থেকে আমার প্রাণ রক্ষা করেছিলো।

রহমানের মুখখানা আনন্দদীপ্ত হয়ে উঠলো, তাড়াতাড়ি করে তাকাতেই দেখলো, অদূরে অশ্বপৃষ্ঠে বসে আছে সেই জমকালো পোশাক পরা অদ্ভুত নারীমূর্তি।